সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

◈ ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ◈ সোমবার ◈ বর্ষ: ৬৫ ◈ সংখ্যা: ৪৭-৪৮

www.weeklyarafat.com

জাতীয় মসজিদ, ঘানা

সাপ্তাহিক
আরাফাত
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
সাপ্তাহিক আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ

যোগাযোগ
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

* বর্ষ : ৬৫
* সংখ্যা : ৪৭-৪৮
* বার : সোমবার

◈ ০৯ সেপ্টেম্বর-২০২৪ ঈসায়ী
◈ ২৫ ভাদ্র-১৪৩১ বঙ্গাব্দ
◈ ০৫ রবিউল আউয়াল-১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

©AH

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة:

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير: أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা: (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল): ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০৩
- **আল কুরআনুল হাকীম:**
  - ❖ **মহান আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দেওয়া**
    আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
- **হাদীসে রাসূল ﷺ:**
  - ❖ **সৎকাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৭
- **প্রবন্ধ:**
  - ❖ **সংখ্যালঘু সমাচার: পড়শির কুম্ভিরাশ্রু**
    আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ১১
  - ❖ **রাসূল (ﷺ)-এর জন্ম তারিখ: এক ঐতিহাসিক পর্যালোচনা**
    মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন- ১৩
  - ❖ **গীবত এবং আখিরাতে গীবতের ভয়াবহ পরিণতি**
    কে. এম আব্দুল জলিল- ১৮
  - ❖ **সমাজ গঠনে নেতৃত্বের অবদান**
    ডা. সুলতান আহমদ- ২৩
- **ক্বাসাসুল হাদীস:**
  - ❖ **সাত রীতিতে কুরআন পাঠের ঘটনা**
    আবূ তাহসীন মুহাম্মদ- ২৫
- **বিশেষ মাসায়িল** ২৬
- **সমাজচিন্তা:**
  - ❖ **ভারতের একতরফা পানি নীতি; সমাধানে আমাদের অবস্থান**
    মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম- ২৮
- **বিশেষ প্রতিবেদন:**
  - ❖ **অন্তর্বর্তীকালীন সরকার; আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা**
    আব্দুল মোমেন- ৩০
- **ইতিহাস-ঐতিহ্য:**
  - ❖ **মুসলিমদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান**
    সংকলনে: হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ূব বিন ইদু মিয়া
    সংকলন সহযোগিতায়: গিয়াসউদ্দীন বিন আব্দুশ শুকুর- ৩২
- **কবিতা** ৩৮
- **জমঈয়ত সংবাদ** ৩৯
- **স্বাস্থ্য-সচেতনতা** ৪০
- **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪১
- **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৬

সম্পাদকীয়

সর্বস্তরে ন্যায়-ইনসাফ নিশ্চিত করা আবশ্যক

আমরা আজ প্রকৃত মানুষ হওয়ার প্রতিযোগিতার চেয়ে জাগতিক ঐশ্বর্য কিংবা প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের লড়াইয়ে ব্যস্ত। আমাদের কাছে মনুষ্যত্ব তুচ্ছ। মানবাধিকারের কথা যতই আমরা বলি, সেটা কেবল বলা, লেখা, প্লাকার্ড, ফেস্টুন বা স্টিকার স্লোগানে সীমাবদ্ধ থাকে। কখনো বা সেমিনার সিম্পোজিয়ামে বিশেষজ্ঞদের আলোচনা ও কবিতা আবৃতি কিংবা প্রবন্ধ পাঠের গণ্ডির মধ্যে আটকে থাকে। মানবতার কোনো চর্চা প্রায়োগিক জগতে পরিলক্ষিত হয় না। মনে হয় যেন জগতের চাকচিক্যের মিছিলে মানবতাবোধ হারিয়ে গেছে। নির্জন নিভৃতে শুধু অশ্রু ঝরাচ্ছে মাত্র। মানবতা ও নৈতিকতার স্লোগান যেন প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই না। প্রকৃত মানুষ হতে হলে অবশ্যই মানবতার মহান সম্রাট বিশ্বনবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর আদর্শ অনুসরণ করতে হবে; তা না হলে কোনোভাবেই মানুষের মাঝে প্রকৃত মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত হবে না। প্রিয় নবী (ﷺ) পরিবারের মধ্যে প্রকৃত মানবতাবোধের চর্চা করে উম্মতকে নির্দেশনা দিয়েছেন এ মর্মে যে, "তামাদের মাঝে সে-ই উত্তম, যে তার পরিবারের মাঝে উত্তম। আর আমি আমার পরিবারে উত্তম।" সন্তানদের প্রতি ইনসাফের নির্দেশনা দিয়ে প্রকৃত মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তিনি বলেন, "তোমরা মহান আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানের মাঝে সমতা বিধান করো।" সামাজিকভাবে সর্বত্র মানবতাবোধ জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে বলেন: "ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন! তোমাদের কেউ ততক্ষণ পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নির্দেশনা দিয়ে তিনি আরো বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপরে ইহসান ফরয করেছেন। যখন তোমরা কোনো প্রাণী জবাই করবে, তাতে ইহসান করো। আর যখন লড়াই করবে, সেখানে ইহসান করবে। তোমাদের কেউ যখন কোনো প্রাণী জবাই করতে যায়, সে যেন তার ছুরি ধারালো করে নেয়।"

প্রিয় নবী (ﷺ) বিনা কারণে গাছপালা কাটতে নিষেধ করেছেন। প্রতিবেশীকে কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন, আল্লাহর কসম সে ঈমানদার নয়, আল্লাহর কসম সে ঈমানদার নয়, আল্লাহর কসম সে ঈমানদার নয়। সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-গণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কে সেই ব্যক্তি? তিনি বললেন, যার অনিষ্ট হতে প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।" অপর বর্ণনায় এসেছে, তিনি (ﷺ) বলেন: তোমাদের কেউ যখন রান্নাবান্না করে, তখন সে যেন একটু জুল বেশি দেয় যাতে সে তার প্রতিবেশীকে কিছু দিতে পারে।" এমনকি যারা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস প্রতিবেশীকে দেয় না, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিচার দিবস অস্বীকারকারীরূপে আখ্যায়িত করেছেন।

এসব নির্দেশনা যদি আমরা কাজে-কর্মে বাস্তবায়ন করতাম, তাহলে আমাদের জন্য ইনসাফ নীতি-নৈতিকতা ও মানবতাবোধ শিখতে অন্য কারো দ্বারস্থ হতে হতো না। আজ যারা মানবতার ফেরি করে, তারাই সামান্য স্বার্থের জন্য মানবতার কণ্ঠরোধ করে। তাদের হাতেই মানুষ ও মনুষ্যত্ব নিষ্পেষিত হয়। পৃথিবীতে সর্বত্র যে হাহাকার, নৈরাজ্য, বিপর্যয় ও পেশীশক্তির বলয় দেখছি, তা তথাকথিত ওই মানবতাবাদীদের দ্বারাই সংঘটিত হচ্ছে।

সুতরাং শুধু কথায় মানবতার জাগরণ নয়; বরং তখনই ব্যক্তি পরিবার ও সমাজে সাম্য মৈত্রী এবং ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমরা মহান আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করব এবং তাঁর প্রেরিত পুরুষ মহানবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর আদর্শ অনুসরণ করে সুন্দর সুখী সমৃদ্ধ পরিবার সমাজ গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করব। যদি আমরা এভাবে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে এবং সমাজের সর্বস্তরে ন্যায়-ইনসাফের সঠিক চর্চা করি এবং প্রতিটি কাজের পূর্বে নিজের বিবেককে প্রশ্ন করি, আমি যা করছি তা-কি কুরআন-হাদীস সম্মত হচ্ছে, আমার কাজ ও আমার জবান কাউকে তো কষ্ট দিচ্ছে না, আমিতো প্রতিবেশীর হক্ব নষ্ট করছি না –এভাবে একজন মানুষ আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে সত্যিকারের ইনসাফ প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হতে পারে। আর তখনই আমাদের সমাজ সুখ ও সমৃদ্ধির স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে এবং আমরা মানুষ হিসাবে শ্রেষ্ঠ জাতির খেতাব পেয়ে ইহ ও পরকালে ধন্য হবো। নতুবা প্রতারণা প্রবঞ্চনা অধিকার বিনষ্ট করা ও যাকে সম্মান দেওয়ার তা না করার কারণে সমূহ বিপদের সম্মুখীন হব আর মনুষ্যত্ব ও মানবতা নিভৃতে অশ্রু ঝরাবে আল্লাহ তা'আলা আমাদের সুবুদ্ধির উদয় দান করুন, সত্যিকারের মানুষ হওয়ার তাওফীক্ব দিন –আমিন। ❑

আল কুরআনুল হাকীম

মহান আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দেওয়া

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার অমিয় বাণী

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○ وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾

সরল বাংলা অনুবাদ

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও; যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকে যা তোমাদেরকে জীবন দান করে এবং জেনে রাখো যে, নিশ্চয় আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে যান। আর নিশ্চয়ই তোমাদেরকে তাঁর কাছেই একত্রিত করা হবে। আর তোমরা সেই ফিতনাকে ভয় করো যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা অত্যাচারী কেবল তাদের ওপরই আপতিত হবে না (বরং সকলের ওপরই পতিত হবে)। আর জেনে রাখো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে খুবই কঠোর।"[১]

শাব্দিক বিশ্লেষণ

يَا শব্দটি حرف النداء অর্থাৎ- আহ্বান সূচক অব্যয়। اَلَّذِيْنَ এটি اسم موصول অর্থ: যারা শব্দটি দু'দিক و منادى الاسماء موصولة معرفة হওয়ার কারণে এবং ال যুক্ত হওয়া فاصلة হিসেবে اَيُّهَا যুক্ত হয়েছে। আর اٰمَنُوْا অর্থ: তারা ঈমান এনেছে। اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ অর্থ: তোমরা আল্লাহর জন্য সাড়া দাও। وَلِلرَّسُوْلِ অর্থ: আর রাসূলের ডাকেও সাড়া দাও। اِذَا যখন/যে সময়ে دَعَاكُمْ অর্থ: তোমাদেরকে ডাকা হয়। لِمَا অর্থ: এমন কিছুর দিকে। يُحْيِيْكُمْ অর্থ: যা তোমাদেরকে জীবন দান করে। وَاعْلَمُوْٓا অর্থ: এবং জেনে রাখো। اَنَّ اللّٰهَ অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ। يَحُوْلُ অর্থ: তিনি অন্তরালে থাকেন। بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ অর্থ: মানুষ এবং তার অন্তরের মাঝে। وَ এবং اَنَّهٗٓ নিশ্চয়ই তিনি اِلَيْهِ তাঁর দিকেই تُحْشَرُوْنَ তোমাদেরকে একত্রিক করা হবে। وَ এবং اتَّقُوْا তোমরা ভয় করো فِتْنَةً পরিক্ষা/ফিতনা-ফাসাদ لَّا تُصِيْبَنَّ আপতিত হবে না الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ তোমাদের মধ্যে যারা অত্যাচারী خَآصَّةً কেবল/শুধুমাত্র/নির্দিষ্ট করে (তাদের ওপরই) وَاعْلَمُوْٓا অর্থ: এবং জেনে রাখো। اَنَّ اللّٰهَ অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ। شَدِيْدُ খুবই কঠোর الْعِقَابِ প্রতিশোধ গ্রহণে।

সূরা ও আয়াতের পরিচয়

দারসে উল্লেখিত আয়াত দু'টি কুরআনুল কারীমের সূরায়ে আনফাল থেকে নেয়া হয়েছে। আয়াতদ্বয় হলো সূরায়ে আনফালের ২৪ ও ২৫ নং আয়াত।

সূরার নামকরণ

এ সূরার প্রথম আয়াতে ব্যবহৃত اَنْفَالٌ শব্দটি দিয়ে এ সূরার নাম করণ করা হয়েছে সূরা আল আনফাল। اَنْفَالٌ শব্দটি نَفْلٌ শব্দের বহুবচন। যার অর্থ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। এ সূরাতে অধিকাংশ বর্ণনা এ সংক্রান্ত তাই নামটি যথার্থ হয়েছে। কেউ কেউ আবার এ সূরাটির নাম সূরা বদরও বলেছেন।[২] কারণ এ সূরার অধিকাংশ আলোচনা বদর যুদ্ধের। কেউ কেউ আবার এ সূরাকে সূরা জিহাদ নামেও অভিহিত করেছেন।

বিষয়বস্তু ও অবতরণের প্রেক্ষাপট

দ্বিতীয় হিজরিতে ইসলাম ও কুফ্‌রের মধ্যে সংঘটিত প্রথম যুদ্ধ হলো– বদর যুদ্ধ। এরই প্রেক্ষিতে এ সূরার প্রায় সবগুলো আয়াতই অবতীর্ণ হয়। সূরার মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে অনুমান করা যায়, সম্ভবত এ সূরাটি একটি মাত্র ভাষণের অন্তর্ভুক্ত তবে এর কোনো কোনো আয়াত বদর যুদ্ধ থেকে উদ্ভূত সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া সত্তেও পরে নাযিল হয়ে থাকতে পারে। পরবর্তী পর্যায়ে ভাষণের ধারাবাহিকতায় এগুলোকে উপযুক্ত স্থানে রেখে এ সমগ্র ভাষণটিকে একটি ধারাবাহিক ভাষণের রূপ দান করা হয়েছে।

---

* *এমফিল গবেষক, জগন্নাত বিশ্ববিদ্যালয়।*

[১] *সূরা আল আনফাল : ২৪-২৫।*

[২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৮৮২।*

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا-এর ব্যাখ্যা: ইরশাদ হচ্ছে– "হে বিশ্বাসীগণ! কুরআনুল কারীমের একটি অসাধারণ বর্ণনা রীতি হলো– প্রয়োজন অনুসারে কোনো একটি বিশেষ সম্প্রদায় কিংবা সমগ্র মানবমণ্ডলীকে সম্বোধন করা।" আলোচ্য আয়াতাংশে ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾ অর্থ: হে বিশ্বাসীগণ! বলে মু'মিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বুঝা যায়, এখানে আল্লাহ সুবহা-নাহু তা'আলা মু'মিনদেরকে একটি বিশেষ হুকুম (বিধান) দিতে চান। যা মু'মিনরা পালন করতে প্রস্তুত থাকবে। আমরা এ বিধান সম্পর্কে জানার পূর্বে মু'মিনদের পরিচয় জানার চেষ্টা করব। স্বয়ং আল্লাহ সুবহা-নাহু তা'আলা মু'মিনদের পরিচয় দিচ্ছেন এভাবে–

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ﴾

অর্থ: "নিশ্চয়ই তারাই মু'মিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে এবং তাতে তারা সন্দেহ পোষণ করে না। আর তারা জীবন ও সম্পদ দিয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা (জিহাদ) করে।"[৩]

সুতরাং বুঝা যায়, আল্লাহ সুবহা-নাহু তা'আলা যখন মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে কোনো বিধান নাযিল করেন, তখন মু'মিনরা এটিকে আল্লাহপ্রদত্ত বিধান বলে যথোপযুক্ত মূল্যায়ন করতঃ তা পালন করাতে সর্বান্তকরণে চেষ্টা করে।

﴿اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ-এর ব্যাখ্যা: ইরশাদ হচ্ছে– "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখন তোমাদেরকে ডাকে।" আবূ সা'ঈদ ইবনু মাআ'ল্লা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, একদা আমি নামায পড়ছিলাম, এমন সময় নবী (ﷺ) আমার পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন। তিনি আমাকে ডাক দেন, কিন্তু আমি নামাযে থাকায় সাথে সাথে তাঁর কাছে যেতে পারলাম না। নামায শেষে তাঁর কাছে পৌঁছলে তিনি আমাকে বলেন, তুমি এতক্ষণ আসনি কেন? আল্লাহ কি তোমাদেরকে বলেননি– ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ﴾ অর্থাৎ- "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও; যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকে যা তোমাদেরকে জীবন দান করে।" অতঃপর তিনি আমাকে বললেন: আমি এখান থেকে চলে যাওয়ার পূর্বে আমি তোমাকে কুরআনের একটি মহা সম্মানিত সূরা শিখিয়ে দেবো। এরপর তিনি যখন যাওয়ার উদ্যোগ নিলেন আমি তাঁকে ঐ কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন, ঐ সূরাটি হচ্ছে– সূরায়ে ফাতিহাহ্। অন্য একটি বর্ণনায় আছে এই ঘটনাটি আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)'র ঘটনা। মোটকথা ঘটনাটি যারই হউক এখানে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ যতদ্রুত সম্ভব পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

﴿لِمَا يُحْيِيْكُمْ-এর ব্যাখ্যা: ইরশাদ হচ্ছে– "যা তোমাদেরকে জীবন দান করে।" মুজাহিদ বলেন– لِمَا يُحْيِيْكُمْ-এর অর্থ হচ্ছে– সত্যের খাতিরে। ক্বাতাদাহ্ বলেন– এটা হচ্ছে কুরআন যাতে মুক্তি, স্থায়িত্ব ও জীবন রয়েছে। সুদ্দী বলেন– ইসলাম গ্রহণের মধ্যে রয়েছে জীবন এবং কুফ্‌রীর মধ্যে মৃত্যু রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এ থেকে জিহাদ বুঝানো হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বিজয়ীর জীবন। আবার কেউ কুরআনের আদেশ-নিষেধ, শরিয়তের বিধি-বিধান অর্থ নিয়েছেন, এর মধ্যে জিহাদও রয়েছে। সারকথা হলো– কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা মেনে চলো, তার ওপর 'আমল করো। এর মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জীবন।

﴿وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ-এর ব্যাখ্যা: ইরশাদ হচ্ছে– এবং জেনে রাখো যে, নিশ্চয় আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে যান। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, তিনি মু'মিন ও কুফ্‌রের মাঝে এবং কাফির ও ঈমানের মাঝে অন্তরায় হয়ে থাকেন। সুদ্দী বলেন, এর অর্থ হচ্ছে– কেউই এই ক্ষমতা রাখে না যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া ঈমান আনে বা কুফ্‌রী করে। ইমাম ইবনু জারীর (রাহিমাহুল্লা-হ)'র অর্থ করেছেন যে, তিনি যখন চান মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যায়। এমনকি মানুষ তার ইচ্ছা ছাড়া কিছুই করতে পারে না। ইমাম শাওকানী বলেন, এ আয়াতের উক্ত সকল অর্থই হতে পারে।[৪] ইমাম ইবনু জারীরের বর্ণিত অর্থের সমর্থন ঐ সকল হাদীস দ্বারা হয়, যাতে দ্বীনের ওপর অবিচল থাকার দু'আ করতে তাকীদ করা হয়েছে। যেমন- নাওয়াস ইবনু সামআ'ন (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (ﷺ) বলতেন– প্রত্যেক অন্তর মহান আল্লাহর দু'টি আঙ্গুলির মধ্যভাগে রয়েছে। আল্লাহ

[৩] *সূরা আল হুজুরা-ত: ১৫।*

[৪] *ফাতহুল কাদীর।*

তা'আলা যখন ওটাকে সোজা রাখার ইচ্ছা করেন তখন তা সোজা থাকে। আর যখন বাঁকা করে দেওয়ার ইচ্ছা করেন তখন তা বাঁকা হয়ে যায়। আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন–

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ.

অর্থাৎ- হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! তুমি আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের ওপর অবিচল রাখো।[৫]

অন্য বর্ণনায় 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র ইবনুল 'আস হতে বর্ণিত আছে–

اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ.

অর্থাৎ- হে অন্তর ফিরানের মালিক! আমাদের অন্তরকে তোমার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দাও।[৬]

উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! অন্তর কি পরিবর্তিত হয়? তিনি উত্তরে বললেন: হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে মানুষের অন্তর সোজা রাখেন এবং ইচ্ছা করলে বাঁকা করে দেন। এ জন্যই আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি–

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ﴾

অর্থাৎ- "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে হিদায়াত দানের পর আমাদের অন্তরগুলোকে বাঁকা করবেন না এবং আপনার নিকট থেকে আমাদেরকে করুণা দান করুন! নিশ্চয়ই আপনি বড় দাতা।"[৭]

﴿وَاَنَّهٗۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ﴾-এর ব্যাখ্যা: ইরশাদ হচ্ছে– "আর নিশ্চয়ই তোমাদেরকে তাঁর কাছেই একত্রিত করা হবে।" অর্থাৎ- মৃত্যুর পর হাশ্‌রের মাঠে আল্লাহ তা'আলার সামনে সকলকে একত্রিত করা হবে বিচারের ও কৃতকর্মের ফলাফল প্রদান করার জন্য।

﴿وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً﴾-এর ব্যাখ্যা: ইরশাদ হচ্ছে– "আর তোমরা সেই ফিতনাকে ভয় করো যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা অত্যাচারী কেবল তাদের ওপরই আপতিত হবে না (বরং সকলের ওপরই পতিত হবে)।" এ আয়াতে কিছু পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ, পাপের আযাব শুধু পাপীদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং পাপ করেনি এমন লোকও তাতে জড়িয়ে পড়ে। সে পাপ যে কি, সে সম্পর্কে মুফাস্‌সিরীন উলামায়ে কিরামের বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন: এখানে ফিতনা বলতে সে সব সামাজিক সামগ্রিক ফিতনা বুঝানো হয়েছে, যা এক সংক্রামক ব্যাধির মতো জন-সমাজে ছড়িয়ে পড়ে, যাতে কেবল গুনাহগার লোকেরাই নিপতিত হয় না, সে লোকেরাও এতে পড়ে মার খায়, যারা গুনাহগার সমাজে বসবাস করাকে বরদাশত করে থাকে। কোনো কোনো মুফাস্‌সির বলেন: আমর বিল মা'রূফ তথা সৎকাজের নির্দেশ দান এবং নাহী আনিল মুনকার অর্থাৎ- অসৎকাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার চেষ্টা পরিহার করাই হলো এই পাপ।[৮] এখানে নিরপরাধ বলতে সেসব লোককেই বুঝানো হচ্ছে যারা মূল পাপে পাপীদের সাথে অংশগ্রহণ করেনি, কিন্তু তারাও 'আম্র বিল মা'রূফ বর্জন করার পাপে পাপী। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: যখন কোনো জাতির এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যে, সে নিজের এলাকায় পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হতে দেখে বাধা দানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাতে বাধা দেয় না, তখন মহান আল্লাহর 'আযাব সবাইকে ঘিরে ফেলে।[৯]

﴿وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾-এর ব্যাখ্যা: ইরশাদ হচ্ছে– "আর জেনে রাখো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে খুবই কঠোর।" অর্থাৎ- অপরাধীদের জন্য তার পক্ষ থেকে তখন কোনো দয়া থাকবে না; বরং তিনি তাদেরকে তখন কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি প্রদান করবেন।

শিক্ষা

এক- আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আহ্বানে সর্বাবস্থায় আমাদেরকে সাড়া দিতে হবে।

দুই- অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধেই নিহিত রয়েছে মানুষের জীবনী শক্তি।

তিন- এই সমাজে এমন কিছু পাপীও আছে যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে মোহর মেরে দিয়েছেন যে, তাদের ফিরে আসার সকলপথ বন্ধ হয়ে গেছে।

চার- সমাজে "সৎকাজের আদেশ আর অসৎ কাজে নিষেধ" না থাকলে সেই সমাজের সকলের ওপর যে কোনো সময় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে শাস্তি নেমে আসতে পারে।

পাঁচ- শাস্তিকে তুচ্ছ ভাবার কোনো কারণ নেই, আল্লাহ তা'আলা শাস্তি দানে খুবই কঠোর। ❑

---

[৫] *আত্ তিরমিযী- ই. ফা. বাং, পরিচ্ছেদ: তাকদীর, হা. ২১৪৩।*

[৬] *সহীহ মুসলিম- ই. ফা. বাং, অধ্যায়: তাকদীর, হা. ৬৫০৯।*

[৭] *সূরা আ-লি 'ইমরান: ৮।*

[৮] *তাফসীর ইবনু কাসীর।*

[৯] *আবূ দাউদ- হা. ৩৭৭৬; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৯৯৯।*

হাদীসে রাসূল ﷺ

সৎকাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ "وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ".

সরল বাংলা অনুবাদ

হুযাইফাহ্ ইবনুল ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, নবী (ﷺ) বলেছেন, সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই তোমরা সৎকাজের জন্য আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করবে। তা না হলে আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই তোমাদের ওপর তার শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। তোমরা তখন তার নিকট দু'আ করলেও তিনি তোমাদের সেই দু'আ গ্রহণ করবেন না।[১০]

বর্ণনাকারীর পরিচয়

তাঁর আসল নাম হুযাইফাহ্, ডাক নাম আবূ 'আব্দিল্লাহ। খায়রুদ্দীন যিরিকলী,[১১] লকব বা উপাধি হচ্ছে 'সাহিবুস সির্র'।[১২] তার পিতার নাম হুসাইল মতান্তরে হিসল ইবনু জাবির। পিতার উপাধি হচ্ছে আল-ইয়ামান। তাঁর পূর্ণ বংশ পরিচয় হচ্ছে– হুযাইফাহ্ ইবনু হিসল বা হুসাইল ইবনু জাবির ইবনে 'আম্র ইবনু রবী'আহ্ ইবনে জারওয়াহ ইবনিল হারেস ইবনু মাযেন ইবনে ক্বাতীআহ্ ইবনু আবস ইবনে বাগীয ইবনু রীস ইবনে গাতফান ইবনু সা'দ ইবনে ক্বায়েস আইলান ইবনু মুযার ইবনে নাযর ইবনু মাআদ ইবনে আদনান আল-আবসী।[১৩]

তিনি গাতফান গোত্রের আবস শাখার সন্তান। এজন্য তাঁকে আল-আবসীও বলা হয়। তাঁর মাতার নাম রিবাব বিনতু ক্বা'ব ইবনু আদী ইবনে আব্দিল আশহাল। তিনি মদীনার আনসার গোত্র আউসের আব্দুল আশহাল শাখার কন্যা।[১৪]

হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র পিতা আল-ইয়ামান মক্কায় ইসলামের প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বানু আবস গোত্রের দশম ব্যক্তি। সে হিসাবে তিনিও পিতার সাথেই ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৫]

রাসূল (ﷺ) মক্কা থেকে মদীনায় আসার পর মুওয়াখাত বা দ্বীনী ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার রীতি চালু করেন। রাসূল (ﷺ) হুযাইফাহ্ ও আম্মার ইবনু ইয়াসার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে দেন।[১৬]

তিনি বদর, ওহোদ, আহযাব বা খন্দক ও তাবূকসহ প্রায় সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন।

হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উত্তম চরিত্রের মূর্তপ্রতিক ছিলেন। রাসূল (ﷺ)-এর নিকট থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ায় তার মধ্যেও রাসূল (ﷺ)-এর অনুপম গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটেছিল। আদব-কায়দা ও আচার-ব্যবহারে তিনি অনন্য ছিলেন।[১৭]

হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ২২৫টি হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যৌথভাবে সহীহুল বুখারী-সহীহ মুসলিম ১২টি এবং এককভাবে সহীহুল বুখারী ৮টি ও সহীহ মুসলিম ১৭টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ৩৬ হিজরি সনে (৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে) 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র শাহাদাতের ৪০ দিন পরে মাদাইন শহরে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

হাদীসের ব্যাখ্যা

কল্যাণকামী সমাজ ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ জরুরি বিষয়। অন্যায় কাজে নিষেধকে আরবীতে বলা হয় 'নাহি আনিল মুনকার' আর সৎকাজের আদেশকে বলা হয় 'আম্র বিল মারুফ'। আল্লাহ তা'আলা যেসব কারণে মুসলিম উম্মাহকে শ্রেষ্ঠ ও কল্যাণকামী জাতি হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন, তন্মধ্যে এই দু'টি 'আমল অন্যতম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

---

★ *প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।*

[১০] *সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২১৬৯; সহীহাহ্- হা. ২৮৬৮।*

[১১] *আল-আ'লাম- ২/১৭১।*

[১২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৭৪৩, ৬২৭৮; আল আ'লাম- ২/১৭১।*

[১৩] *আল ইসাবাহ্- ১/৩১৭; আল ইসতি'আব- ইবনু আব্দিল বার্র, ১/৯৮।*

[১৪] *রিজালু সহীহ মুসলিম- আবূ বক্‌র আল ইসফাহানী, ১/১৪৫; আল ইসতি'আব- ১/৯৮।*

[১৫] *হুযাইফাহ্ ইবনুল ইয়ামান আমীনু সির্রে রাসূলিল্লাহি- ইব্‌রাহীম মুহাম্মাদ আল 'আলী, দিমাশক : দারুল কলাম, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ খ্রি./১৪১৭ হি., পৃ. ২৯।*

[১৬] *সিয়ারু 'আলামীন নুবালা- হাফেয শামসুদ্দীন আয্ যাহাবী, ২/৩৬২; সীরাতু ইবনু হিশাম- ১/৫০৬।*

[১৭] *হুযাইফাহ্ ইবনুল ইয়ামান আমীনু সির্রে রাসূলিল্লাহি- পৃ. ১০৩-৪।*

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ﴾

“তোমরা তো হচ্ছ শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজে আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে। আর যদি আহলে কিতাবরা ঈমান আনতো তাহলে তাদের জন্য কল্যাণ হতো। তাদের মধ্যে কতক রয়েছে ঈমানদার এবং অধিকাংশই রয়েছে ফাসিক্ব।[১৮]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾

“তোমাদের মধ্যে এমন এমন একটি দল থাকা চাই যারা কল্যাণের দিকে মানুষকে ডাকবে এবং সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই হবে সফলকাম।”[১৯]

মু’মিনরা ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿اَلْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾

“মু’মিন নর ও মু’মিন নারী একে অপরের বন্ধু, এরা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্য নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে; এদেরকেই আল্লাহ কৃপা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।”[২০]

রাসূলের অনুসারীদের কাজ হলো সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করা। আল্লাহ বলেন,

﴿اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ۖ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

“যারা অনুসরণ করে এমন রাসূলের যিনি উম্মী নবী যার উল্লেখ তাদের কাছে লিখিত তাওরাত ও ইঞ্জিলে রয়েছে যে তাদেরকে সৎকার্যের নির্দেশ দেয় ও অসৎকার্যে বাধা দেয়।[২১]

আমর বিল মারূফ ও নেহি আনিল মুনকারের ফযীলত: আমর বিল মারূফ এবং নেহি আনিল মুনকার ইসলামের একটি অত্যবশ্যকীয় দায়িত্ব। একটি মৌলিক স্তম্ভ এবং এ ধর্মের অনন্য বৈশিষ্ট্য। সংস্কার ও সংশোধনের বিশাল মাধ্যম। তার মাধ্যমে সত্যের জয় হয় এবং মিথ্যা ও বাতিল পরাভূত হয়। তার মাধ্যমে শান্তি ও সমৃদ্ধির বিস্তার ঘটে। কল্যাণ ও ঈমান বিস্তৃতি লাভ করে। যিনি আন্তরিকতা ও সততার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন তার জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার ও মর্যাদাপূর্ণ পারিতোষিক। কুরআনে অসংখ্য আয়াত এর প্রমাণ বহন করে। যেমন–

(১) আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿اَلْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾

“মু’মিন নর ও মু’মিন নারী একে অপরের বন্ধু, এরা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্য নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে; এদেরকেই আল্লাহ কৃপা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।”[২২]

আয়াতে পরিষ্কার দেখা গেল যে, আল্লাহ তা‘আলা আমর বিল মারূফ ও নেহি আনিল মুনকারের ওপর রহমতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

(২) রাব্বুল ‘আলামীন ‘আম্র বিল মারূফ ও নেহি আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালনকারীদের প্রশংসা এবং তাদের পরিণাম ও শেষ ফল কল্যাণময় বলে বর্ণনা করেছেন।[২৩]

(৩) আমর বিল মারূফ ও নেহি আনিল মুনকার পার্থিব মুসিবত ও পারলৌকিক শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖٓ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍۭ بَئِيْسٍۢ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ﴾

---

[১৮] *সূরা আ-লি ‘ইমরান : ১১০।*
[১৯] *সূরা আ-লি ‘ইমরান : ১০৪।*
[২০] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৭১।*
[২১] *সূরা আল আ’রাফ : ১৫৭।*
[২২] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৭১।*
[২৩] *সূরা আ-লি ‘ইমরান : ১০৪।*

"যে উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল তারা যখন সেটা বিস্মৃত হয় তখন অসৎকার্য হতে নিবৃত্ত করত তাদেরকে আমি উদ্ধার করি এবং যারা যুল্‌ম করে ও দুষ্কর্ম করত বলে আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিই।"[২৪]

(৪) আমর বিল মারূফ ও নেহি আনিল মুনকার পরিত্যাগ করা মহান আল্লাহর লানত, গজব ও ঘৃণার কারণ এবং এ কারণেই দুনিয়া ও পরকালে কঠিন শাস্তি নেমে আসবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۭ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ○ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ۭ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ﴾

"বানী ইসরা-ঈলের মধ্যে যারা কুফ্‌রী করেছিল তারা দাঊদ ও মারইয়ামের ছেলে 'ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল– এটা এই জন্য যে, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তারা যেসব গর্হিত কাজ করত তা হতে তারা একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত তা কতই না নিকৃষ্ট।"[২৫]

অন্যায়ে বাধা দেওয়ার সামর্থ্য না থাকলে কমপক্ষে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতে হবে। প্রিয়নবী (ﷺ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যদি কোনো খারাপ কাজ বা বিষয় দেখে তাহলে সে যেন হাত দিয়ে তা পরিবর্তন করে দেয়, যদি তা করতে অপারগ হয় তাহলে যেন মুখ দিয়ে তার প্রতিবাদ করে, যদি তাও করতে সক্ষম না হয় তাহলে যেন অন্তর দিয়ে তা ঘৃণা করে, আর এটাই হচ্ছে ঈমানের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বলতম স্তর।'[২৬]

সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ না করার পরিণতি: হাদীসে বলা হয়েছে,

أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

তা না হলে আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই তোমাদের ওপর তার শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। তোমরা তখন তার নিকট দু'আ করলেও তিনি তোমাদের সেই দু'আ গ্রহণ করবেন না।[২৭]

সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ না করলে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং তাদের কোনো দু'আ কবুল করবেন না। অপরদিকে মুনাফিক্বরা মন্দ কাজের আদেশ দেয় এবং ভালো কাজ থেকে নিষেধ করে।

﴿اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ﴾

"মুনাফিক্ব পুরুষ ও মুনাফিক্ব নারীরা একে অপরের অংশ, তারা মন্দ কাজের আদেশ দেয়, আর ভালো কাজ থেকে নিষেধ করে, তারা নিজদের হাতগুলোকে সঙ্কুচিত করে রাখে।"[২৮]

عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَنَّهُ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ وَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ "إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوْا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ".

আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হে লোকসকল! তোমরা তো অবশ্যই এই আয়াত তিলাওয়াত করে থাকো– ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিজেদেরই কর্তব্য তোমাদেরকে সংশোধন করা। যদি তোমরা সৎপথে থাকো তাহলে যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।"[২৯] অথচ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আমি বলতে শুনেছি– মানুষ যদি কোনো অত্যাচারীকে অত্যাচারে লিপ্ত দেখেও তার দু'হাত চেপে ধরে তাকে প্রতিহত না করে তাহলে আল্লাহ অতি শীঘ্রই তাদের সকলকে তার ব্যাপক শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত করবেন।[৩০]

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَرِيْرٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِيْ هُمْ أَعَزُّ مِنْهُمْ وَأَمْنَعُ لَا يُغَيِّرُوْنَ إِلَّا عَمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ".

জারীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কোনো জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে পাপাচার হতে থাকে এবং তাদের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদের পাপাচারীদের বাধা দেয় না, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর ব্যাপকভাবে শাস্তি পাঠান।[৩১]

عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "إِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ لَمَّا وَقَعَ فِيْهِمُ النَّقْصُ كَانَ الرَّجُلُ يَرَى أَخَاهُ عَلَى الذَّنْبِ فَيَنْهَاهُ

---

[২৪] *সূরা আল আ'রাফ : ১৬৫।*
[২৫] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৭৮-৭৯।*
[২৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৪।*
[২৭] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২১৬৯, হাসান।*
[২৮] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৬৭।*
[২৯] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ১০৫।*
[৩০] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২১৬৮।*
[৩১] *ইবনু মাজাহ্- হা. ৪০০৯; সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৩৩৯।*

عَنْهُ فَإِذَا كَانَ الْغَدُ لَمْ يَمْنَعْهُ مَا رَأَى مِنْهُ أَنْ يَكُوْنَ أَكِيْلَهُ وَشَرِيْبَهُ وَخَلِيْطَهُ فَضَرَبَ اللهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ وَنَزَلَ فِيْهِمُ الْقُرْآنُ فَقَالَ ﴿لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيْرًا مِنْهُمْ فَاسِقُوْنَ﴾". قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) مُتَّكِئًا فَجَلَسَ وَقَالَ "لَا حَتَّى تَأْخُذُوْا عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ فَتَأْطِرُوْهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا".

আবূ ‘উবায়দাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, বানী ইসরা-ঈলের মধ্যে এভাবে পাপাচারের সূচনা হয় যে, কোনো ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইকে পাপাচরে লিপ্ত দেখলে সে তাকে তা থেকে বারণ করতো। কিন্তু পরদিন সে তাকে পাপাচারে লিপ্ত দেখে নিষেধ করতো না; বরং তার সাথে মেলামেশা ও উঠাবসা করতো এবং তার সাথে পানাহারে অংশগ্রহণ করতো। ফলে আল্লাহ তা‘আলা তাদের পরস্পরের অন্তরকে মৃত্যুদান করেন। তাদের সম্পর্কে তিনি কুরআন মাজীদে আয়াত নাযিল করেন। তিনি বলেন, বানী ইসরা-ঈলের মধ্যে যারা কুফ্‌রী করেছিল তারা দাউদ ও মারইয়ামের ছেলে ‘ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল– এটা এই জন্য যে, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তারা যেসব গর্হিত কাজ করত তা হতে তারা একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত তা কতই না নিকৃষ্ট। তাদের অনেকেই তুমি কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। কত নিকৃষ্ট তাদের কৃতকর্ম!– যে কারণে আল্লাহ তা‘আলা তাদের ওপর রাগান্বিত হয়েছেন। তাদের শাস্তিভোগ স্থায়ী হবে। মহান আল্লাহতে, নবীতে ও তার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান আনলে তারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না, কিন্তু তাদের অনেকে ফাসিক্ব।[৩২] রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। তিনি সোজা হয়ে বসে বলেন, না! তোমরা জালেমের হাত ধরে তাকে জোরপূর্বক সত্যের ওপর দাঁড় করিয়ে দিবে।[৩৩]

[৩২] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৭৮-৮১।*
[৩৩] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪০০৬।*

‘আম্‌র বিল মারূফ ও নেহি আনিল মুনকারের উপকারিতা: সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদানে অনেক উপকারিতা রয়েছে, তার কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হলো–

(১) মন্দ ও অন্যায় দেখে তা প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার পদক্ষেপ না নেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কুরআন ও হাদীসে এ ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি এসেছে। সুতরাং আমার বিল মারূফ ও নেহি আনিল মুনকারের মাধ্যমে আল্লাহর সে শাস্তি হতে দূরে থাকা যায় ও পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

(২) আল্লাহ তা‘আলা কল্যাণ ও নেক কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করার উৎসাহ এবং নির্দেশ দিয়েছেন। ‘আম্‌র বিল মারূফ ও নেহি আনিল মুনকারের মাধ্যমে উক্ত নির্দেশের বাস্তবায়ন হয় এবং কল্যাণ ও নেকির কাজে সহযোগিতা হয়।

(৩) সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। কারণ এর মাধ্যমে যাবতীয় অকল্যাণ ও অনিষ্ট বিদূরিত হয়। ফলে মানুষ স্বীয় দ্বীন-জান-সম্পদ ও সম্মানের ব্যাপারে নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা বোধ করে।

(৪) এর মাধ্যমে অন্যায় ও অনিষ্টের হার হ্রাস পায়। সমাজ থেকে মন্দ ও অশ্লীল কাজের প্রতিযোগিতা প্রদর্শনী বিলুপ্ত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যেগুলো মূলত সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করত। ফলে সমাজ শান্তি শৃঙ্খলা, মিল-মহব্বত ও সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে উঠে।

হাদীসের শিক্ষা

- যে কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখবে, তার ওপর সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করা ওয়াজিব।
- সে এই ওয়াজিব পালন থেকে রেহাই পাবে না, যতক্ষণ না অন্য কেউ এ দায়িত্ব পালন করবে।
- প্রত্যেকেই সামর্থ্য অনুযায়ী এ দায়িত্বে আঞ্জাম দিবে।
- যে বান্দা যত অধিক সামর্থ্য রাখবে, তার ওপর তত অধিক সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের দায়িত্ব পালন করা ওয়াজিব।
- পাপী ও গুনাহগারদের ওপর মহান আল্লাহর ‘আযাব নাযিল হলে পাপ কাজে বাধা দানকারীগণই কেবল ‘আযাব থেকে পরিত্রাণ পাবে। অন্যথায় সকলেই ‘আযাবে গ্রেফতার হবে।

উপসংহার

সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ না করলে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং তাদের কোনো দু‘আ কবুল করবেন না। ❑

প্রবন্ধ

সংখ্যালঘু সমাচারঃ পড়শির কুম্ভিরাশ্রু

–আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

গত ৫ আগস্ট বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার বিপ্লব ঘটে গেল। বেঁচে থাকার প্রশ্নে মানুষের দু'টি অধিকার আবশ্যক। তা হলো– সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা। একজন ভিক্ষুকও চায় তার ভিক্ষালব্ধ সম্পদ নিরাপদ থাকুক। তার পর্যায়ে সম্মান নিরাপদ থাকুক। ভিক্ষা দিবেন না, না দেন, কিন্তু তাই বলে কুকুর তো লেলিয়ে দিতে পারেন না। এটি তার পেশা ও সম্মানের জন্য হানিকর। অধিকারের প্রশ্নও বটে।

বিগত দেড়দশকে এ দেশের ১৮ কোটি মানুষ তো কোনো না কোনোভাবে অসম্মানিত হয়েছে। হয়েছে হেনস্তা। আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ ও শান্তিতে নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ড. ইউনূস, এমনকি তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও কম অপদস্ত হননি। ড. ইউনূসকে লোহার খাঁচায় রেখে বিচারের নামে প্রহসন করেছেন। বিচারের নামে বিদ্যুতহীন অবস্থায় অশীতিরপরবৃদ্ধ ড. ইউনূসকে দৈনিক একাধিকবার বিচারের জন্য ৮ তলা বিল্ডিং-এ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে বাধ্য করেছেন। পদ্মা নদীতে তাঁকে একাধিকবার চুবানোর হুমকি দেশবাসী শুনেছে।

বেগম খালেদা জিয়া নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। ইয়াতীমের দু'কোটি টাকা হরণ করেছেন (?) এই অপবাদে প্রতি সপ্তাহে তাঁকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। নানা অসুখ-বিসুখে জর্জরিত সপ্ততিপর ভদ্র মহিলাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে যাবার সুযোগ দেননি। বিচার বিভাগ, সিভিল ও পুলিশ-প্রশাসনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে দেশবাসীকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছিলেন।

তাঁর সামনে-পিছনে, ডানে-বামে যারা থেকেছেন তাদেরও সীমাহীন খবরদারিতে থাকতে হতো। সে সুযোগে পদলেহনকারীরা দেশকে লুটপাটের রাজত্বে পরিণত করেছিল। সংখ্যালঘু হিন্দুরা তার দল আওয়ামী লীগের নেতাদের দ্বারা বেশি লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হয়েছে। সংখ্যালঘুদের যারা দুর্বল তাদের জায়গা-জমি, ঘর-বাড়ি, মন্দির, শ্মশান থেকে শুরু করে ভিটেমাটি সহায়-সম্বল দখল ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে ওই সব সুবিধাভোগীদের বিরুদ্ধে। গত বছরের ৬ জানুয়ারি মহাজোট সরকার গঠনের ৪ দিন পর থেকেই দখল প্রক্রিয়া ও নির্যাতন শুরু হয়। মারধর, শ্লীলতাহানির পাশাপাশি আগুনে পুড়িয়ে, কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে বেশ কয়েকটি। এসব বিষয়ে আওয়ামী নেতাদের কাছে নালিশ জানিয়ে কোনো প্রতিকার পাওয়া যায়নি। কোনো কোনো এলাকার আওয়ামী লীগ নেতারা নির্যাতিতদের সহযোগিতার বদলে দলীয় দখলবাজ সন্ত্রাসীদের পক্ষ নেয়ার অভিযোগ রয়েছে।

তৃতীয়বারের মতো আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নির্যাতিত হিন্দু ও জাতিগত সংখ্যালঘুরা ঢাকায় এসে কয়েকটি সংবাদ-সম্মেলন করে এসব অভিযোগ দেশবাসীর কাছে তুলে ধরেছে। সংবাদ সম্মেলনের একটি ব্যানারে লেখা ছিল, 'নৌকার কাণ্ডারী ও মাঝি-মাল্লা কর্তৃক হামলা-মামলা, নির্যাতন ও বাপ-দাদার ভিটে-ভূমি, সহায়-সম্পদ জবরদখলের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন'। এসব সংবাদ সম্মেলনে নির্যাতিত হিন্দুরা স্পষ্ট করে বলেছেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরাই তাদের জমি, বাড়ি দখলের জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। এরই মধ্যে অনেককে নির্যাতনের মাধ্যমে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। সরকার দলীয় সাংসদদেরকেও তারা কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন।

প্রায় দেড়দশক থেকে একটি পড়শী দেশের আস্কারা পেয়ে আওয়ামী লীগ সরকার সারা দেশকে 'আয়না ঘর' বানিয়েছেন। হত্যা, গুম, নির্যাতনে যেন আবহমান বাংলার আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। এমনি একটা প্রেক্ষাপটে ছাত্র-জনতার আন্দোলন শুরু হয়। কোটা ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য উত্থিত দাবি ক্রমশঃ দম্ভ ও অহংকারের হুংকারে দমিত হয়নি; বরং এক দফা দাবিতে পরিণত হয়। অবশেষে ৫ আগস্ট দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হন সরকার প্রধান।

সামরিক হেলিকপ্টারে আরোহণ করে আগরতলায় যান সরকার প্রধান। সুদূর দিল্লি থেকে দ্রুত আগরতলা

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। **প্রফেসর ও সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

পৌঁছান ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা প্রধান অজিত ডোভাল। আপাততঃ সাময়িক অনুমতির কথা বলে দিল্লির অনতিদূরে হিন্ডন বিমান বন্দরে সেইফ হাউজে আশ্রয় নিয়েছেন। ৩০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর ভারত সরকার নড়ে চড়ে বসে। 'পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম' না-কি অন্যদেশে প্রেরণ, ইত্যকার কথা চালাচালি বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

ইত্যবসরে ভারত সরকারের কুম্ভিরাশ্রু বাংলাদেশের জনগণকে হতচকিত করে তুলেছে। ১২০ কোটির দেশ ভারতে মুসলমানের সংখ্যা অন্ততঃ ত্রিশ কোটি। সংখ্যালঘু এই মুসলিম সম্প্রদায়কে নাজেহাল করতে কসুর করেনি। গো-হত্যার অজুহাতে অসংখ্য মানুষকে পিটিয়ে হত্যা করেছে। হিজাব পরার অপরাধে পাঠশালা থেকে বহিস্কারের নির্দেশনামা মুসলিম সমাজকে বিহ্বল করে তুলেছে। দেশান্তর করেছে ইসলামী পণ্ডিত ও দাঈ'দের।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জানিয়েছে, ভারতে লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদির ৬৩ শতাংশ ভাষণ ছিল ঘৃণা উদ্রেককারী। গত ১৬ মার্চ নির্বাচন আচরণ বিধি কার্যকর হওয়ার পর জনসভায় প্রধানমন্ত্রীর দেয়া ১৭৩টি বক্তব্য বিশ্লেষণ করে এমন তথ্য পাওয়া যায়। বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার তৃতীয়বারের মতো মেয়াদ শুরুর আগে প্রচারণার সময় প্রান্তিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বৈষম্য, শত্রুতা ও সহিংসতাকে উস্কে দেয়া হয়েছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ মনে করছে, ধারাবাহিকভাবে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব এই ধরনের ঘৃণা উদ্রেককারী মন্তব্য করার কারণে ভারতে মুসলমান ও খ্রিষ্টান এই দুই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপরে হামলার ঘটনা বেড়েই চলেছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর প্রতিবেদনে বলা হয়, বিজেপি'র নেতৃত্বাধীন বেশ কয়েকটি রাজ্যের সরকার যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়াই মুসলমানদের বাড়ি-ঘর, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয় ধ্বংস করছে, যা বে-আইনি। নির্বাচনের পর এই কার্যকলাপ অব্যাহত রয়েছে। ফলে সারা দেশে অন্তত ২৮টি হামলার খবর পাওয়া গেছে। যার কারণে ১২ জন মুসলমান পুরুষ ও একজন খ্রিষ্টান নারীর করুণ মৃত্যুও হয়েছে।

বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ পতনের পর পড়শিদের কুম্ভিরাশ্রু মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে হিন্দুদের ওপর বানানো আক্রমণের অভিযোগগুলোকে হাতিয়ার বানিয়ে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার পাঁয়তারা করছে। সিএএ-কে সহজীকরণের ফলে অসচ্ছল হিন্দুরা পাড়ি জমাতে উৎসাহবোধ করছে। বিজেপি রাজ্যসভার জনৈক সাংসদ বলেন, ওপার বাংলায় সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হচ্ছেন! ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটছে। অথচ ঘোরতরো মুসলিম বিদ্বেষী হিসেবে পরিচিত আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সগতোক্তি করেছেন, বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা পালিয়ে আসছেন না। হাসিনা সরকারের পতনের পর রাজনৈতিক সংকটের মুখে হিন্দুরা ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টাই করেনি, নির্যাতিত হয়নি। বরঞ্চ তাদেরই দোসর আওয়ামী লীগ আমলে আওয়ামী নেতা-কর্মীদের দ্বারা সবচাইতে বেশি নির্যাতিত হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পূর্ব পর্যন্ত সমূহ নির্যাতনের রাজসাক্ষী আওয়ামীলীগ নিজেই। আর সেসব ভিডিও সম্পাদনা করে তুলে ধরছে নতুন আঙ্গিকে। আমার ছাত্র বলরাম বিশ্বাস, ছাত্রী খুকুমনি রায়কে জিজ্ঞেস করে জেনেছি– না স্যার আমরা তো ভালোই আছি। অসুবিধা কিসের? দেশতো আমাদের। খুব খুশি হয়েছি তাদের এসব কথা শুনে। আমার উচ্চশিক্ষিত ঘনিষ্ঠ বন্ধু জয়ন্ত রায়, মৃত্যুঞ্জয়ও ব্রজেনের খবর নিয়েছি। তারা তো সহাস্যবদনে ভালো থাকার কথা জানিয়েছেন। তাঁরা সংখ্যালঘু পরিচয় দেবে কেন? তারা বাঙালি, বাংলাদেশি। পড়শিদের একজন চিৎকার করছেন, 'এক কোটি শরণার্থীর জন্য ভারতবাসী প্রস্তুত হও'। দারুণভাবে নিগৃহীত রাষ্ট্রহীন নাগরিক রোহিঙ্গাদের দু'মুঠো ভাত দিতে পারে না। অথচ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির লালনভূমি বাংলাদেশকে অস্থির করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন।

অন্যায় করা, অন্যায়ে সহযোগিতা করা সমান অপরাধ। দীর্ঘদিন নির্বাচনবিহীন সরকারের ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার অন্যতম দোসর পড়শিরা। পড়শিদের চাণক্যনীতি বিশ্ববাসী ধরে ফেলেছে। রক্তাক্ত মনিপুরীদের সামলাতে না পেরে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ইস্যু 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা'র নামান্তর। এটি নিছক মানুষের দৃষ্টি ফেরানোর কূট-কৌশল মাত্র। বাংলাদেশের শান্তিময় পররাষ্ট্রনীতি সকলের সাথে বন্ধুত্ব, শত্রুতা নয়। সুতরাং এ নীতির আলোকে আলোকিত হয়ে পড়শিদের ভাববার অনুরোধ রইলো। পড়শিরা শান্তিতে থাকলে নিজেদের মধ্যে শান্তি বজায় থাকে। ❑

রাসূল (ﷺ)-এর জন্ম তারিখঃ এক ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

–মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন

মুহাম্মাদ (ﷺ) সর্বশেষ নবী। দুনিয়ার সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব। পৃথিবীতে সংস্কারক হিসেবে যাদের আবির্ভাব হয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ মুহাম্মদ (ﷺ)। বিশ্বের বহু খ্যাতিমান পুরুষ মুহাম্মদ (ﷺ)-এর জীবনী নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং এককথায় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, তিনিই একমাত্র সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক। পৃথিবীতে তাঁর অবদানের কোনো বিকল্প নেই, হতে পারে না। তিনি যে বার্তা নিয়ে এ ধরায় এসেছিলেন এটিই শ্রেষ্ঠ বার্তা, মানবের জন্য কল্যাণকর গাইডলাইন। এই বার্তা-গাইডলাইনের মধ্যেই বিশ্বমানবতার শান্তি নিহিত-এটি অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই কারো। আর সেই রাসূল (ﷺ)-এর জন্মের দিন ও মাস নির্দিষ্ট করা নিয়ে সীরাত প্রণেতা ও ঐতিহাসিকগণ মতানৈক্য করেছেন। এ মতানৈক্যের যৌক্তিক কারণও রয়েছে। যেহেতু কারো জানা ছিল না যে, এ নবজাতক ভবিষ্যতে বড় কিছু হবে? অন্য নবজাতকের জন্মকে যেভাবে নেয়া হতো তার জন্মকেও সেভাবে নেয়া হয়েছে। এ জন্য কারো পক্ষে রাসূল (ﷺ)-এর জন্ম তারিখ নির্দিষ্টভাবে নিশ্চিত করেননি।

ড. মুহাম্মদ তাইয়্যেব আন্ নাজ্জার (রাহিমাহুল্লাহ)-বলেন: "সম্ভবত এর রহস্য হলো– যখন তিনি জন্ম গ্রহণ করেন তখন তার থেকে কেউ এমন বিপদ আশঙ্কা করেনি। এ জন্যই জন্মলগ্ন থেকে নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত সময়ে আলোচনায় আসেননি। চল্লিশ বছর বয়সে যখন আল্লাহ তাঁকে রিসালাতের দাওয়াত পৌঁছানোর নির্দেশ প্রদান করেন তখন থেকে মানুষ এ নবী সংক্রান্ত তাদের স্মৃতিতে গেঁথে থাকা ঘটনাগুলো স্মরণ করতে থাকে এবং একে অপরকে তাঁর জীবনের খুঁটিনাটি সব ইতিহাস জিজ্ঞেস করতে থাকে। এ বিষয়ে তাদেরকে অনেকটা সমৃদ্ধ করেছে বুঝবান হওয়ার পর থেকে নিজের সম্পর্কে রাসূল (ﷺ)-এর বর্ণনা- যে ঘটনাগুলো তিনি পার করেছেন অথবা তাঁর ওপর দিয়ে পার হয়েছে। অনুরূপভাবে তার সাহাবীগণের বর্ণনা ও এসব ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গদের বর্ণনা। এভাবে মুসলমানেরা তাদের নবীর ইতিহাস সংক্রান্ত শ্রুত সব ঘটনা সংগ্রহ করা আরম্ভ করেন, যেন কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য তা বর্ণনা করে যেতে পারে"।[৩৪]

রাসূল (ﷺ)-এর জন্ম দিন: রাসূল (ﷺ)-এর জন্ম দিন সম্পর্কে হাদীসে এসেছে–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ؟ قَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيْهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ فِيْهِ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيْهِ».

আবূ ক্বাতাদাহ্ আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সোমবার দিনে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন: "এই দিনে (সোমবার) আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই দিনেই আমি নবুওয়াত পেয়েছি।[৩৫]

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন, সোমবারে নবুওয়াত লাভ করেন, সোমবারে ইন্তেকাল করেন, সোমবারে মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনার পথে রওয়ানা করেন, সোমবারে মদীনা পৌঁছান এবং সোমবারেই তিনি হাজারে আসওয়াদ উত্তোলন করেন।[৩৬]

রাসূল (ﷺ)-এর জন্ম বছর: হাদীসে এসেছে–

قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ وُلِدْتُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ، (ﷺ) عَامَ الْفِيْلِ. وَسَأَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قُبَاثَ بْنَ أَشْيَمَ أَخَا بَنِيْ يَعْمُرَ بْنِ لَيْثٍ أَأَنْتَ أَكْبَرُ أَمْ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) أَكْبَرُ مِنِّيْ وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِيْلَادِ وُلِدَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) عَامَ الْفِيْلِ وَرَفَعَتْ بِيْ أُمِّي عَلَى الْمَوْضِعِ قَالَ وَرَأَيْتُ خَذْقَ الْفِيْلِ أَخْضَرَ مُحْيِلًا. قَالَ أَبُوْ عِيْسَىٰ هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

ক্বাইস ইবনু মাখরামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হস্তী বছরে (আবরাহার বাহিনী ধ্বংসের বছর) জন্মগ্রহণ করি। তিনি বলেন, ইয়াসার ইবনু লাইস গোত্রীয় কুবাস ইবনু আশইয়ামকে 'উসমান ইবনু আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রশ্ন করেন, আপনি বড় না-কি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার চাইতে অনেক বড়, তবে আমি তাঁর আগে জন্মগ্রহণ করি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাতির বছর জন্ম গ্রহণ করেছেন। আমার মা আমাকে এমন জায়গায় নিয়ে গেলেন যেখানে গিয়ে আমি পাখিগুলোর (হাতিগুলোর) মলের রং সবুজে বদল হয়ে যেতে দেখেছি। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধু মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি।[৩৭]

---

[৩৪] *আল কাওলুল মুবিন ফী সীরাতে সায়্যিদিল মুরসালীন- পৃ. ৭৮।*

[৩৫] *মুসলিম- মিশর, কায়রো, দারুল এহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, তা. বি., ২/৮১৯, মাকতাবাতুশ্ শামেলাহ, হা. ১৯৭/১১৬২।*

[৩৬] *আল মুসনাদ- ইবনু হাম্বল, মিসর, দারুল মা'আরিফ, ১৯৫০, ৪/১৭২-১৭৩, নং ২৫০৬, সম্পাদক : আহমদ শাকির সনদ আলোচনা করে বলেছেন : হাদীসটির সনদ সহীহ।*

[৩৭] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৬১৯।*

ইমাম ইবনুল কাইয়ূম (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন: "এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কার অভ্যন্তরে হস্তি বাহিনীর বছর জন্ম গ্রহণ করেন।[৩৮]

মুহাম্মদ ইবনু ইউসুফ সালেহি (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন: "ইবনু ইসহাক (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন: তার জন্ম ছিল হস্তি বাহিনীর বছর। ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন: অধিকাংশ আলেমের নিকট এ অভিমতটি প্রসিদ্ধ। ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইব্রাহীম ইবনু মুনযির বলেছেন: এ ব্যাপারে কোনো আলেম দ্বিমত পোষণ করেননি। খলিফা ইবনু খাইয়্যাত, ইবনুল জাযযার, ইবনু দিহইয়াহ, ইবনুল জাওযি ও ইবনুল কাইয়্যেম প্রমুখ আরেকটু বাড়িয়ে এ মতের ওপর সকল সিরাত প্রণেতার ইজমা (মতৈক্য) উল্লেখ করেছেন।[৩৯]

রাসূলে করীম (ﷺ)-এর শুভাগমন হয় 'আমুল ফিল'-এ তথা অভিশপ্ত আবরাহা তার বিশাল হাতি বাহিনী নিয়ে কাবার ওপর যে বছর আক্রমণ করে, সেই বছরে রাসূল (ﷺ) শুভ জন্মলাভ করেন। এই বিষয়ে সকল ঐতিহাসিক ও সীরাত প্রণেতাগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন।[৪০]

হাতি বাহিনীর অভিযানের কয় দিন পর রাসূল (ﷺ)-এর আবির্ভাব ঘটে তা নিয়ে অবশ্য বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়, তবে যে মতটি সর্বাধিক প্রচলিত ও অধিক প্রসিদ্ধ তা হলো– পঞ্চাশ দিন পরে রাসূল (ﷺ) জন্মলাভ করেন।

হাফেয ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন, "জন্ম লাভ করেন 'আমুল ফিল'-এ। কেউ কেউ বলেন, ঘটনার এক মাস পরে; আর কেউ কেউ বলেন, পঞ্চাশ দিন পরে, আর এই মতটিই অধিক প্রসিদ্ধ।"[৪১]

হস্তিবাহিনীর ঘটনা: আবরাহা সাবাহ হাবশী (সে সম্রাট নাজ্জাশী হাবশের পক্ষ হতে ইয়েমেনের গভর্নর ছিল) যখন দেখলো যে, আরববাসী কা'বাঘরের হজ্জ পালন করছে এবং একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ থেকে লোকজন সেখানে আগমন করছে তখন সানআয় সে একটি বিরাট গির্জা নির্মাণ করলো এবং সেই গির্জাকে কেন্দ্র করে হজ্জ পালন করার জন্য আরববাসীকে আহ্বান জানালো।

কিন্তু বানু কেনানা গোত্রের লোকজন যখন এই সংবাদ অবগত হলো তখন তারা এক রাতে গোপনে গির্জায় প্রবেশ করে তার সামনের দিকে 'মল'-এর প্রলেপন দিয়ে একদম নোংরা করে ফেললো।

উক্ত ঘটনায় আবরাহা ভয়ানক ক্রোধান্বিত হয় এবং প্রতিশোধ গ্রহণার্থে কাবাঘর ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে প্রায় ষাট হাজার অস্ত্রসজ্জিত সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হয়। সে নিজে একটি শক্তিশালী হাতির পিঠে আরোহণ করে। সৈন্যদের কাছে মোট নয়টি মতান্তরে তেরটি হাতি ছিল।

আবরাহা ইয়েমেন হতে অগ্রসর হয়ে 'আল মাগাম্মাস' নামক স্থানে পৌঁছে এবং সেখানে তার সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত করে মক্কায় প্রবেশের উদ্দেশ্যে সামনে অগ্রসর হলো। অতঃপর যখন মুজদালিফা এবং মিনার মধ্যবর্তী স্থান ওয়াদিয়ে মুহাসসারে পৌঁছলো তখন আবরাহার হাতিটি মাটিতে বসে পড়লো। কা'বা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য কোনোভাবেই তাকে উঠানো সম্ভব হলো না। অথচ উত্তর, দক্ষিণ কিংবা পূর্বমুখে যাওয়ার জন্য তাকে উঠানোর চেষ্টা করলে সে তৎক্ষণাৎ উঠে দৌড়াতে শুরু করতো। এমন সময়ে আল্লাহ এক ঝাঁক ছোট পাখি প্রেরণ করলেন। কুরআন মাজীদে সেই পাখিগুলোকে 'আবাবীল' বা ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই পাখিগুলো পাথরের ছোট ছোট টুকরো বয়ে এনে সৈন্যদের ওপর নিক্ষেপ করতে লাগলো। প্রত্যেকটি পাখি তিনটি করে পাথরের টুকরো বা কঙ্কর নিয়ে আসতো– একটি ঠোঁটে এবং দু'টি দুই পায়ে। কঙ্করগুলো আকারে ছিল বুটের সমান। কিন্তু কঙ্করগুলো শরীরের যেখানে লাগতো ফেটে গিয়ে সেখান থেকে রক্তপ্রবাহিত হতে হতে সে মরে যেত।

উক্ত কঙ্কর দ্বারা সকলেই যে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল এমনটি নয়। কিন্তু এই অলৌকিক ঘটনায় সকলেই ভীষণভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং প্রাণভয়ে সে স্থান ছেড়ে পালানোর উদ্দেশ্যে যখন বেপরোয়াভাবে ছোটোছুটি শুরু করে তখন পদতলে পিষ্ট হয়ে অনেকেই মৃত্যুবরণ করে। কঙ্করের আঘাতে ছিন্নভিন্ন এবং পদতলে পিষ্ট হয়ে দু'ভাবেই পলকে পলকে বীরপুরুষগণ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে থাকে।

অন্যদিকে আবরাহার ওপর আল্লাহ তা'আলা এমন এক কঠিন মুসিবত প্রেরণ করলেন যে তার আঙ্গুলসমূহের জোড় খুলে গেল এবং 'সানা' নামক স্থানে যেতে না যেতেই সে পাখির বাচ্চার মতো হয়ে পড়ে। অতঃপর তার বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে হৃৎপিণ্ড বেরিয়ে আসে এবং সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মক্কা অভিমুখে আবরাহার অভিযানের সংবাদ অবগত হয়ে মক্কাবাসী প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পলায়ন করে পাহাড়ের আড়ালে কিংবা পর্বত চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। অতঃপর যখন তারা অবগত হলো যে, আবরাহা এবং তার বাহিনী সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তখন তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

---

[৩৮] *যাদুল মা'আদ- আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম, ১/৭৬ পৃ.।*

[৩৯] *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সিরাতে খাইরিল ইবাদ- ১/৩৩৪-৩৩৫ পৃ.।*

[৪০] *আল বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া- ২/৩২১; সিফাতুস্ সাফওয়াহ- ১/৫১; আর্ রাওযুল আনফ- ১/২৭৬।*

[৪১] *আল বিদায়া- ২/৩২১।*

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের অভিমত হচ্ছে, উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল রাসূল (ﷺ)-এর জন্মগ্রহণের মাত্র ৫০ কিংবা ৫৫ দিন পূর্বে মুহাররম মাসে। এই প্রেক্ষিতে এটা ধরে নেয়া যায় যে, ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল ৫৭১ ঈসায়ী সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ ভাগে কিংবা মার্চ মাসের প্রথম ভাগে।[৪২]

কিছু কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন রাসূল (ﷺ)-এর জন্ম হস্তি বাহিনীর ১০/২৩/৪০ বছর পর। এ সম্পর্কে ড. আকরাম জিয়া আল-উমরি বলেন: "সত্য হলো– বিপরীত বর্ণনাগুলোর প্রত্যেকটির সনদ দুর্বল। যে বর্ণনাগুলোতে বলা হয়েছে যে, তাঁর জন্ম ছিল হস্তি বাহিনীর ১০ বছর অথবা ২৩ বছর অথবা ৪০ বছর পর। কিন্তু অধিকাংশ আলেম বলেছেন তাঁর জন্ম হয়েছে হস্তিবাহিনীর বছর। আধুনিক যুগে মুসলিম ও পাশ্চাত্যপন্থী গবেষকদের পরিচালিত গবেষণাও এ মতকে সমর্থন করে। তাদের মতে, হস্তি বাহিনীর বছর হচ্ছে– ৫৭০ অথবা ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দ।[৪৩]

রাসূল (ﷺ)-এর জন্ম তারিখ: রাসূল (ﷺ)-এর জন্ম তারিখ নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। যেমন-

১. কারো মতে, তাঁর জন্ম তারিখ অজ্ঞাত, তা জানা যায়নি এবং তা জানা সম্ভব নয়। তিনি সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এটুকুই শুধু জানা যায়, জন্ম মাস বা তারিখ জানা যায় না। এ বিষয়ে কোনো আলোচনা তারা অবান্তর মনে করেন।

২. কারো মতে, তিনি রবিউল আউয়াল মাসের ২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় হিজরি শতকের অন্যতম ঐতিহাসিক ও মাগাযী প্রণেতা মুহাদ্দিস আবূ মাশার নাজীহ ইবন আর রহমান আস-সিনদী (১৭০ হি.) এই মতটি গ্রহণ করেছেন।

৩. অন্যমতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্ম তারিখ ১০ রবিউল আউয়াল। এই মতটি ইমাম হুসাইনের পৌত্র মুহাম্মাদ ইবন 'আলী আল বাকের (১১৪ হি.) থেকে বর্ণিত। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস 'আম্র ইবনু শারাহিল আশ শা'বী (১০৪ হি.) থেকেও এই মতটি বর্ণিত। ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবনু 'উমার আলওয়াকেদী (২০৭ হি.) এই মত গ্রহণ করেছেন। ইবনু সা'দ তার বিখ্যাত "আত্ তাবাকাতুল কুবরা"য় শুধু দু'টি মত উল্লেখ করেছেন, ২ তারিখ ও ১০ তারিখ।[৪৪]

৪. অন্যমতে, তাঁর জন্ম তারিখ রবিউল আউআল মাসের ৮ তারিখ। আল্লামা কাসতাল্লানী ও যারকানীর বর্ণনায় এই মতটিই অধিকাংশ মুহাদ্দিস গ্রহণ করেছেন। এই মতটি দু'জন সাহাবী ইবনু 'আব্বাস ও জুবাইর ইবনু মুত্ব'ঈম (رضي الله عنهم) থেকে বর্ণিত। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও সীরাতুন্নবী বিশেষজ্ঞ এই মতটি গ্রহণ করেছেন বলে তারা উল্লেখ করেছেন। প্রখ্যাত তাবেয়ী ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম ইবনু শিহাব আয্ যুহরী (১২৫ হি.) তাঁর উস্তাদ প্রথম শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও নসববিদ ঐতিহাসিক তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনু জুবাইর ইবনে মুত্ব'ঈম (১০০ হি.) থেকে এই মতটি বর্ণনা করেছেন। কাসতালানী বলেন: "মুহাম্মাদ ইবনু জুবাইর আরবদের বংশ পরিচিত ও আরবদের ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জন্ম তারিখ সম্পর্কিত এই মতটি তিনি তাঁর পিতা সাহাবী জুবাইর ইবনু মুত্ব'ঈম থেকে গ্রহণ করেছেন। স্পেনের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফিকহ 'আলী ইবনু আহমদ ইবনে হাযম (৪৫৬ হি.) ও মুহাম্মাদ ইবনু ফাতুহ আল-হুমাইদী (৪৮৮ হি.) এই মতটিকে গ্রহণেযাগ্য বলে মনে করেছেন। স্পেনের মুহাদ্দিস আল্লামা ইউসূফ ইবনু 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্দুল বার (৪৬৩ হি.) উল্লেখ করেছেন যে, ঐতিহাসিকগণ এই মতটিই সঠিক বলে মনে করেন। মীলাদের ওপর প্রথম গ্রন্থ রচনাকারী আল্লামা আবুল খাত্তাব ইবনু দিহয়া (৬৩৩ হি.) ঈদে মীলাদুন্নবীর ওপর লিখিত "আত্ তানবীর ফী মাওলিদিল বাশির আন নাযীর" গ্রন্থে এই মতটিকেই গ্রহণ করেছেন।[৪৫]

৫. ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ-২) বলেন: "কেউ কেউ বলেছেন ২ রবিউল আউয়াল। ইবনু 'আব্দুল বার্ "ইস্তেআব" গ্রন্থে এ অভিমত উল্লেখ করেন এবং ওয়াকেদি এ বর্ণনাটি আবূ মাশার নাজিহ ইবনু 'আব্দুর রহমান আল মাদানী থেকেও উদ্ধৃত করেন"।[৪৬]

৬. ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ-২) আরো বলেন: "কেউ বলেছেন: ৮ রবিউল আউয়াল। হুমাইদি এ বর্ণনাটি ইবনু হাজম থেকে বর্ণনা করেন। আর মালেক, উকাইল ও ইউনুস ইবনু ইয়াযিদ প্রমুখ এটি বর্ণনা করেন জুহরি থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনু জুবাইর ইবনে মুত্ব'ঈম থেকে। ইবনু 'আব্দুল বার্ বলেন, ঐতিহাসিকরা এ মতটিকে সঠিক বলেছেন। হাফেয মুহাম্মদ ইবনু মূসা আল খাওয়ারজেমি এ তারিখের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত। হাফেয আবুল খেতাব ইবনু দিহইয়াহ 'আত্ তানবির ফি মাওলিদিল বাশিরিন নাজির' গ্রন্থে এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন"।[৪৭]

৭. ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ-২) আরো লিখেছেন: "কেউ বলেন: ১০ রবিউল আউয়াল। এ মতটি ইবনু দিহইয়াহ তার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনু আসাকের এ মতটি আবূ জাফর আল বাকের থেকে এবং মুজালিদ নামক রাবী শাবি থেকে বর্ণনা করেন"।[৪৮]

---

[৪২] *আর্ রাহীকুল মাখতুম- আল্লামা সফিউর রহমান মোবরকপুরী, ঢাকা : পিস পাবলিকেশন, পৃ. ৯১-৯২।*

[৪৩] *আস্ সিরাতুন নববিয়াহ আস্ সাহীহাহ্- ১/৯৭ পৃ.।*

[৪৪] *আত্ তাবাকাতুল কুবরা- ইবনু সা'দ, বৈরুত, দারুল এহইয়ায়েত তুরাসিল আরাবী, ১/৪৭।*

[৪৫] *পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (ﷺ) : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা- ড. খোন্দকার আবূ নসর মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ই. ফা. পত্রিকা, এপ্রিল- জুন'২০০৩, পৃ. ৯।*

[৪৬] *আস্ সিরাতুন নববিয়াহ- ১/১৯৯ পৃ.।*

[৪৭] *আস্ সিরাতুন নববিয়াহ- ১/১৯৯ পৃ.।*

[৪৮] *আস্ সিরাতুন নববিয়াহ- ১/১৯৯ পৃ.।*

৮. কারো মতে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্ম তারিখ ১২ রবিউল আউয়াল। এই মতটি হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (১৫১ হি.) গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাতির বছরে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন।"[৪৯]

এখানে লক্ষণীয় যে, ইবনু ইসহাক সীরাতুন্নবীর সকল তথ্য সাধারণতঃ সনদসহ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এই তথ্যটির জন্য তিনি কোনো সনদ উল্লেখ করেননি। কোথা থেকে তিনি এই তথ্যটি গ্রহণ করেছেন তাও জানাননি বা সনদসহ প্রথম শতাব্দীর কোনো সাহাবী বা তাবেয়ী থেকে মতটি বর্ণনা করেননি। এ জন্য অনেক গবেষক এই মতটিকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।[৫০]

৯. ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "যারা বলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জুমু'আর দিন রবিউল আউয়াল মাসের সতের তারিখ জন্ম গ্রহণ করেছেন, তাদের কথা সুদূর পরাহত; বরং ভুল। জনৈক শিয়া মতাবলম্বী কর্তৃক লিখিত "ইলামুর রুওয়া বি আলামিল হুদা"নামক গ্রন্থ থেকে হাফেজ ইবনু দিহইয়াহ এমতটি উদ্ধৃত করেছেন। এরপর তিনি এ মতের দুর্বলতা প্রমাণ করেছেন। এ মতটি আসলেই দুর্বল। যেহেতু এটি হাদীসের বিপরীত"।[৫১]

১০. কারো কারো মতে, তিনি মুহাররম মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন। **১১.** অন্যমতে, তিনি সফর মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন। **১২.** অন্যমতে তিনি রবিউস সানী মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন। **১৩.** অন্যমতে তিনি রজব মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন। **১৪.** অন্যমতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্ম তারিখ ১৭ই রবিউল আউয়াল। **১৫.** অন্যমতে তাঁর জন্ম তারিখ ২২ রবিউল আউয়াল।

১৬. অন্যমতে তিনি রমযান মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন। ৩য় হিজরি শতকের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যুবাইর ইবনু বাক্কার (২৫৬ হি.) থেকে এই মতটি বর্ণিত। তাঁর মতের পক্ষে যুক্তি হলো যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সর্বসম্মতভাবে রমযান মাসে নবুওয়াত পেয়েছেন। তিনি ৪০ বৎসর পূর্তিতে নবুওয়াত পেয়েছেন। তাহলে তাঁর জন্ম অবশ্যই রমযানে হবে।[৫২]

১৭. মুসান্নাফ ইবনু আবি শায়বাতে জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ ও 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত **১৮** রবিউল আউয়াল।[৫৩] **১৮.** স্বনামধন্য মুহাদ্দিস ও গবেষক শায়খ আহমদ শাকের (রাহিমাহুল্লাহ) (আহমদ বিন মুহাম্মদ আব্দুল কাদের, মৃ. ১৩৭৭ হি.) তিনিও শায়খ বৈজ্ঞানিক মাহমুদ পাশার গবেষণা মেনে নিয়েছেন এবং সে গবেষণা থেকে সূর্যগ্রহণ-বিষয়ক সহযোগিতা নিয়েছেন।[৫৪]

১৯. আবূ কাসেম আস্ সুহাইলি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "গণিতবিদগণ বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্ম সৌরমাস "নিসান"-এর বিশ তারিখে ছিল"।[৫৫] **২০.** ডক্টর হামিদুল্লাহ বলেন, He was born on 17th june, 569 A.D।[৫৬]

২১. The Encyclopedia of Islam-এ বলা হয়েছে– would put the date of this birth at about 570 A.D।[৫৭]

২২. আল্লামা শিবলী নুমানী ও সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী (রাহিমাহুল্লাহ) প্রণীত সাড়া-জাগানো সীরাত-গ্রন্থ হলো 'সীরাতুন্নবী'। এ গ্রন্থে বলা হয়েছে 'নবী (ﷺ)-এর জন্ম দিবস সম্পর্কে মিশরের প্রখ্যাত জোতির্বিজ্ঞানী মাহমূদ পাশা এক পুস্তিকা রচনা করেছেন। এতে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পবিত্র বেলাদত (জন্ম) ৯ রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার, মোতাবেক ২০ এপ্রিল ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দ। মাহমূদ পাশা যে প্রমাণপত্র দিয়েছেন তা কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তৃত।' তাদের গবেষণা বিষয়ের একটি দিক হলো যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সহীহ হাদীসে নিজেই বলেছেন, তাঁর জন্মের দিন হচ্ছে সোমবার। মাহমূদ পাশা গবেষণা ও হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, সে বছর ১২ রবিউল আউয়াল তারিখের দিনটা সোমবার ছিল না ছিল বৃহস্পতিবার। আর সোমবার ছিল ৯ রবিউল আউয়াল।

২৩. আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী লিখেছেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কার বিখ্যাত বনু হাশেম বংশে ৯ রবিউল আওয়াল (ফীলের বছর) সোমবার দিন রাতের মহাসন্ধিক্ষণে সুবহে সাদিকের সময় জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজি পঞ্জিকামতে তারিখটি ছিল ৫৭১ ঈসায়ী সালের ২০ অথবা ২২ এপ্রিল। এ বছরটি ছিল বাদশাহ নওশেরওয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার চল্লিশতম বছর। বিশিষ্ট

---

[৪৯] *আস্ সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ- ইবনু হিশাম, মিশর, কায়েরা, দারুর রাইয়ান, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৮, ১/১৮৩।*

[৫০] *আস্ সীরাতুন নাবাবীয়াহ- আহমদ মাহদী রেজকুল্লাহ, ১০৯ পৃ.।*

[৫১] *আস্ সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ- ১/১৯৯ পৃ.।*

[৫২] *আত্ তাবাকাতুল কুবরা- ইবনু সা'দ, ১/১০০-১০১; আল বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া- ইবনু কাসীর, বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৬, ২/২১৫; আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা- আহমদ বিন মুহাম্মাদ আল-কাসতালানী, বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলিময়্যা, ১ম সংস্করণ ১৯৯৬, ১/৭৪-৭৫; শরহুল মাওয়াহিব আল লাদুন্নিয়্যা- আল যারকানী, বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলিময়্যা, ১ম সংস্করণ ১৯৯৬, ১/২৪৫-২৪৮।*

[৫৩] *আল বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া- আবুল ফিদা, হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর কায়রো, দারুল রাইয়্যান, লিত্ তুরাস, ১ম প্রকাশ ১৪০৮ হি./১৯৮৮ ইং, ১/২৪২।*

[৫৪] *'আলাল মুহাল্লা বিল আসার- হাশিয়াতুশ শায়খ আহমদ শাকের, ৫/১১৪-১১।*

[৫৫] *আর্ রওদুল উন্‌ফ- ১/২৮২।*

[৫৬] *Muhammad Rasul ullah- Muhammad Hamidullah, Karachi, 1979, p.1।*

[৫৭] *The Encyclopedia of Islam- London, iussc & Co. leiden, E.J. Bril, 1936, V-3, P. 642।*

শিক্ষাবিদ মুহাম্মদ সোলায়মান সালমান (রাহিমাহুল্লাহ-র) এবং মাহমুদ পাশা ফাল্কীর অনুসন্ধানলব্ধ সঠিক অভিমত হচ্ছে এটাই।[৫৮]

২৪. আরবের গবেষক সৌরবিজ্ঞানী 'আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু ইব্রাহীম (মৃ. ১৪১৬ হি.) লিখেছেন, "বিশুদ্ধ রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (ﷺ) শুভাগমন হয় ২০ এপ্রিল ৫৭১ ইংরেজিতে আমুল ফিল'-এ। সুতরাং তাঁর জন্ম-মৃত্যুর দিন খুব সূক্ষ্মভাবে বের করা সম্ভব। এর ভিত্তিতে বর্ণনার বিচারে ও যুক্তির আলোকে রাসূল (ﷺ)-এর জন্মতারিখ হলো ৯ রবিউল আউয়াল হিজরিপূর্ব ৫৩ সন মোতাবেক ২০ এপ্রিল, ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দ।[৫৯]

মাওলানা হিফজুর রহমান (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, মাহমুদ পাশা (কুসতুনতুনিয়ার প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও সৌরবিজ্ঞানী ছিলেন) তিনি জ্যোতির্বিদ্যার আলোকে যে নক্ষত্রসূচি/বর্ষপুঞ্জি প্রণয়ন করেছেন, যার উদ্দেশ্য ছিল রাসূল (ﷺ)-এর যুগ থেকে এ যুগ পর্যন্ত সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের যত ঘটনা ঘটে গিয়েছে তার একটা সঠিক হিসাব বের করা। তিনি তাতে পূর্ণ তাহক্বীকের সাথে প্রমাণ করেছেন যে, রাসূল (ﷺ)-এর মোবারক জন্মের বছরে কোনোভাবেই সোমবার ১২ রবিউল আউয়ালে পড়ে না; বরং তা একমাত্র ৯ রবিউল আউয়ালেই পড়ে। শক্তিশালী দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে, বিশুদ্ধ সূত্র ও বর্ণনার নিরিখে, জ্যোতির্বিদ্যা ও সৌরবিজ্ঞানের আলোকে রাসূল (ﷺ)-এর জন্মগ্রহণের গ্রহণযোগ্য প্রামাণ্য তারিখ হলো ৯ রবিউল আউয়াল।[৬০]

নাতায়েজু আফহাম নামক গ্রন্থের এক সংস্করণে ভূমিকা লিখেছেন সে যুগের প্রসিদ্ধ ইসলামিক চিন্তাবিদ, ইতিহাসবিদ ও বিখ্যাত সাহিত্যিক শাইখ আলি তানতাবী (রাহিমাহুল্লাহ-র) (মৃ. ১৪২০ হি.)। তিনি নিজের লিখিত ভূমিকায় গ্রন্থ প্রণেতা কর্তৃক গৃহীত প্রাধান্য পাওয়া ৯ তারিখের মতের পক্ষে জোরদার সমর্থন জুগিয়েছেন।[৬১]

সহীহ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূল (ﷺ)-এর জন্ম সোমবারে হয়েছে। কোন তারিখ সেটা বলা নেই। অতএব সোমবার ঠিক রাখতে গেলে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব মতে ৯ রবিউল আউয়ালই সঠিক জন্ম তারিখ হয়, ১২ রবিউল আউয়াল নয়, যা প্রসিদ্ধ আছে।[৬২]

তাঁর জন্মের কাহিনীতে প্রসিদ্ধ আছে যে, (১) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খাৎনাকৃত ও নাড়ী কাটা অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হন। (২) কেউ তার লজ্জাস্থান দেখেনি। (৩) শৈশবে বক্ষবিদারণের দিন জিব্‌রা-ঈল তাঁর খাৎনা করেন।[৬৩] (৪) জান্নাত থেকে আসিয়া ও মারইয়াম নেমে এসে ধাত্রীর কাজ করেন। (৫) আবূ লাহাব মৃত্যুর পরে তার পরিবারের কোনো একজনকে (বলা হয়ে থাকে, 'আব্বাসকে) স্বপ্ন দেখান। তাকে বলা হয় আপনার অবস্থা কি? তিনি বলেন, আমি জাহান্নামে। তবে প্রতি সোমবার আমার আযাব হালকা করা হয় এবং আমার এই দুই আঙ্গুল থেকে পানি চুষে পান করি। আর এটা এ কারণে যে, নবী (ﷺ)-এর জন্মের সুসংবাদ দানের ফলে আমি আমার দাসী সুয়াইবাহকে মুক্ত করে দেই এবং সে নবীকে দুধ পান করায়। উল্লেখ্য যে, আবূ লাহাব ২য় হিজরিতে সংঘটিত বদর যুদ্ধের সপ্তাহকাল পরে মারা যান। 'আব্বাস তখন কাফের ছিলেন এবং ৮ম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হন। (৬) রাসূল প্রসবের সময় তার মা বলছেন যে, আমার গুপ্তাঙ্গ দিয়ে 'নূর' অর্থাৎ- জ্যোতি বিকশিত হয়। যা শামের প্রাসাদসমূহকে আলোকিত করেছিল। নবী জননী যা স্বচক্ষে দেখেছিলেন। এটি ছিল ভবিষ্যতে শাম এলাকা ইসলামের আলোকে আলোকিত হওয়ার আগাম সুসংবাদ। (৭) পারস্যের কিসরা রাজপ্রাসাদ কেঁপে উঠেছিল এবং তার ১৪টি চূড়া ভেঙ্গে পড়েছিল। আর এটি ছিল তাঁর ভবিষ্যৎ নবী হওয়ার অগ্রিম সুসংবাদ। (৮) এ সময় মজূসীদের পূজার আগুন নিভে গিয়েছিল। (৯) ইরাকের সাওয়া হ্রদের পানি শুকিয়ে গিয়েছিল এবং তার পার্শ্ববর্তী গির্জাসমূহ ধসে পড়েছিল ইত্যাদি।[৬৪] (১০) ঐ সময় কাবাগৃহের ৩৬০টি মূর্তি ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে।

বলা বাহুল্য, উপরে বর্ণিত সকল বর্ণনাই ভিত্তিহীন কল্পকথা মাত্র।[৬৫]

ইসলামে জন্মদিন বা জন্মদিন পালন বলতে কিছু নেই। বছরের যে দিনটিতে কেউ জন্ম গ্রহণ করেছে, সেই দিনকে তার জন্য বিশেষ কোনো দিন মনে করা বা এই উপলক্ষ্যে আনন্দ-ফুর্তি করা অথবা কোনো 'আমল করার বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর কোনো ভিত্তি পাওয়া যায় না। সাহাবী ও তাবেঈন-এর যুগে জন্মদিন পালনের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। যদি জন্মদিন বলতে ইসলামে কোনো কিছু থাকত তাহলে হাদীস ও ইতিহাসের কিতাবগুলোতে সাহাবী ও তাবেঈন-এর জন্মদিন পালনের কোনো না কোনো ঘটনা থাকত। অথচ তাদের জন্মদিন পালনের কোনো প্রমাণ কোনো সূত্রেই পাওয়া যায় না। এমন কি জন্মদিনের বিশেষ কোনো গুরুত্বই তাদের কাছে ছিল না। ❑

---

[৫৮] *আর রাহীকুল মাখতুম- পৃ. ৯৭।*

[৫৯] *তাকভীমুল আযমান- পৃ. ১৪৩।*

[৬০] *কাসাসুল কুরআন- ৪/২৫৩।*

[৬১] *মুকাদ্দামাতুত তানতাবী- ৮৩।*

[৬২] *রহ্‌মাতুল্লিল 'আলামীন (উর্দূ)- সুলায়মান বিন সালমান মানসুরপুরী (মৃ. ১৯৩০ খ্রি.), দিল্লী : ১৯৮০ খ্রি., ১/৪০; আর্ রাহীক্- পৃ. ৫৪; মা শা-'আ- ৫-৯ পৃ.।*

[৬৩] *য'ঈফাহ্- হা. ৬২৭০।*

[৬৪] *মুখতাসার সীরাতুর রাসূল (ﷺ)-'আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নাজদী, রিয়াদ : ১ম সংস্করণ ১৪১৪/১৯৯৪ খ্রি. ১৮-২০ পৃ.; আর্ রাহীকুল মাখতূম- মুবারকপুরী, কুয়েত : ২য় সংস্করণ ১৪১৬/১৯৯৬ খ্রি., ৫৪ পৃ.।*

[৬৫] *সীরাতুর রাসূল (ﷺ)।*

গীবত এবং আখিরাতে গীবতের ভয়াবহ পরিণতি

–কে. এম আব্দুল জলিল*

ভূমিকা: গীবত একটি ভয়াবহ পাপের কাজ। বর্তমান সমাজে যে সব পাপের প্রচলন সবচেয়ে বেশি তন্মধ্যে গীবত অন্যতম। এই পাপটি নীরব ঘাতকের মতো বান্দার অজান্তেই এটা তার নেকির ভাণ্ডার নিঃশেষ করে দেয় এবং তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে ছাড়ে। আর এই কাজটি চুরি-ডাকাতি, সুদ-ঘুষ, যিনা-ব্যভিচার ও মরা মানুষের পচা মাংস খাওয়ার চেয়েও মারাত্মক ও নিকৃষ্ট। কিন্তু অবাক হলো এই জঘন্য পাপ কাজটি মানুষ অবাধে করে থাকে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে মহান আল্লাহর ঘর মসজিদে বসে ও অনেকে এই গর্হিত কাজটি করতে দ্বিধাবোধ করে না। সমাজের পরিচিত নেক্কার বান্দাদের মধ্যেও খুব কম সংখ্যক মানুষই গীবতের এই নোংরা পাপ থেকে বাঁচতে পারে।

গীবতের সংজ্ঞা: الغيبة (গীবাহ) শব্দের অর্থ: কুৎসা, পরনিন্দা, পরোক্ষে নিন্দা।[৬৬] ইংরেজিতে গীবতের প্রতিশব্দ: Calumny, Slander, Gossip, Speaking ill of others, অর্থাৎ- মিথ্যা কলংক, অপবাদ, পরচর্চা করা, রটনা, অভিশংসন এবং কারো চরিত্র হননের জন্য প্রদত্ত মিথ্যা বিবৃতি।[৬৭]

মোটকথা, কারো মধ্যে যদি সত্যিকারার্থেই কোনো দোষ-ত্রুটি, আর সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যদি তিনি অপছন্দ করেন, তাহলে সেই সত্যি কথাটি অপরকে বলে দেয়ার নামই হলো গীবত বা পরনিন্দা। আর যদি সেই দোষ তার মধ্যে না থাকে, তবে সেটা 'বুহতান' বা অপবাদ।

গীবতের ধরনসমূহ– গীবত বলা হয় অপরের এমন সমালোচনা করা, যা শুনলে তার খারাপ লাগবে বা মন খারাপ হবে। এই সমালোচনা অন্যের দৈহিক ত্রুটি, বংশগত দোষ, চারিত্রিক ত্রুটি, কাজ-কর্ম, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ি, গাড়ি-ঘোড়া সম্পর্কিত দোষ হলেও তা গীবত।

১. শারীরিক গঠন বা অবয়বের গীবত: যেমন- কাউকে হেয় বা তাচ্ছিল্য করে বলা হয় কানা, খোঁড়া, ল্যাংড়া, লম্বু, খাটো, কালা, হলদে, ধলা, অন্ধ, ট্যারা, টেকো মাথা, চোখে ছানি পড়া, ঠোঁট মোটা, কান ছোট, নাক বোঁটা, ঠসা প্রভৃতি। উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যদি এগুলো অপছন্দ করেন, তবে তা গীবত হিসেবে পরিগণিত হবে।

২. চারিত্রিক আচার-আচরণের গীবত: যেমন- কাউকে উদ্দেশ করে বলা ফাসেক্ব, খিয়ানতকারী, পিতামাতার অবাধ্য, গীবতকারী, সালাত পরিত্যাগকারী, যাকাত অনাদায়কারী, ব্যভিচারী, অহংকারী, বদমেজাজী, কাপুরুষ, দুর্বল মনের অধিকারী, ঝগড়াটে, নির্লজ্জ, দুশ্চরিত্র, স্বেচ্ছাচারী, রূঢ়, লম্পট, বেয়াদব, অবিবেচক, আলস, ধূর্ত, প্রবঞ্চক, ধূমপায়ী, নেশাখোর ইত্যাদি।

৩. বংশের গীবত: যেমন- কাউকে অবজ্ঞা করে বলা অজাত, ছোটলোক, মুচি, চামার, কাঠমিস্ত্রী, ভ্যান চালক, তাঁতি, বিহারী ইত্যাদি। বংশের দিকে বা পিতামাতার দিকে সম্বন্ধ করে অপছন্দনীয় যাই বলা হবে, তাই গীবত।

৪. পরোক্ষ গীবত: পরোক্ষ গীবত বলতে এমন পরনিন্দাকে বুঝায়, যা সরাসরি না বলে ভিন্ন আঙ্গিকে বলা হয়ে থাকে। যেমন- অমুক পণ্ডিত, অমুক সাহেব, অমুক নেতা ইত্যাদি তাচ্ছিল্যের সাথে বলা। অর্থাৎ- দোষ বা ত্রুটি বর্ণনার সময় সম্বোধিত ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করলেও শ্রোতা বুঝে নিতে পারে কাকে উদ্দেশ করে এই কথাগুলো বলা হচ্ছে।

গীবতের মাধ্যম

১. জিহবার গীবত: মানুষের মুখ এক অঙ্গ, যার মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি পাপ সংঘটিত হয়। যে ব্যক্তি মুখ সংযত রাখতে পারে, তার পক্ষে অনেক কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। শুধু মুখের কারণে পরিবার, সমাজ এমনকি একটি রাষ্ট্রও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে। মিথ্যাকে বলা হয় সকল পাপের মূল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মিথ্যাকে বড় গুনাহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এই মিথ্যা মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। নবী করীম (ﷺ) বলেছেন, "নিশ্চয়ই সত্য পুণ্য ও নেক 'আমলের পথ দেখায়। আর নেক 'আমল জান্নাতের পথ দেখায়। আর যে ব্যক্তি সত্য বলতে বলতে আল্লাহর কাছে সিদ্দিক হিসেবে পরিগণিত হয়। আর মিথ্যা পাপের পথ দেখায়, আর পাপ পাপীকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। ব্যক্তি মিথ্যা বলতে বলতে আল্লাহর খাতায় 'কাযযাব' (চরম মিথ্যুক) বলে চিহ্নিত হয়ে যায়।[৬৮] এছাড়া গীবত বা দোষ চর্চা, চোগলখোরী, মিথ্যা সাক্ষ্য, মিথ্যা শপথ, অশ্লীল গালি। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, 'মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেক্বী (মহান আল্লাহর অবাধ্য আচরণ) এবং

---

* *সভাপতি, ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস ও উপ-গ্রন্থাগারিক, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

[৬৬] *আল মু'জামুল ওয়াফী- ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫, পৃ. ৭৪০।*

[৬৭] *English-Bangla Dictionary- ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০২২, পৃ. ১১৫।*

[৬৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬০৯৪।*

তার সঙ্গে লড়াই, ঝগড়া করা কুফ্‌রী।[৬৯] উপহাস করা, খোটা দেয়া, অনর্থক কথা বলা, অভিশাপ দেয়া ইত্যাদি।

২. অন্তরের গীবত: মুখের গীবতের সাথে পরিচিত থাকলেও অন্তরের গীবত অনেকের নতুন। যেমন- অন্যের সম্পর্কে খারাপ কথা বলা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি অন্যের সম্পর্কে খারাপ চিন্তা করাও নিষিদ্ধ। অন্যের দোষ-ত্রুটি নিয়ে কল্পনা করাও নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾

অর্থাৎ- "হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাকো; কারণ কোনো কোনো অনুমান পাপ।"[৭০]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "তোমরা কুধারণা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ নিশ্চিত কুধারণা সবচেয়ে মিথ্যা কথা।"[৭১]

৩. ইশারা-ইঙ্গিতের গীবত: কখনো কখনো চোখ, হাত ও মাথার ইশারার মাধ্যমেও গীবত হয়ে থাকে। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, "একজন খাটো মহিলা (আমাদের ঘরে) প্রবেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বসেছিলেন। আমি আমার বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে রাসূল (ﷺ)-এর দিকে এভাবে ইশারা করে বললাম, إِنَّهَا قَصِيرَةٌ 'সে তো বেঁটে মহিলা'। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তুমি তো তার গীবত করে ফেললে'।[৭২]

৪. লেখালেখির মাধ্যমে গীবত: মানুষের মনের ভাব ও মতামত প্রকাশের একটি বড় মাধ্যম হলো লেখা। গীবত যে কোনো মাধ্যমে অপরের কুৎসা রটানো যেতে পারে। সেটা ইশারা-ইঙ্গিত, কাজ-কর্ম, অঙ্গভঙ্গি, খোঁটা দেয়া ও লেখালেখির মাধ্যমে যার নিন্দা করা হচ্ছে তিনি অপছন্দ করেন এমন যে কোনো মাধ্যম।

যে মানুষের গীবত করা যায়: কোনো ব্যক্তি যদি এমন হয় যে, ধর্মীয় ক্ষেত্রে মানুষের কাছে অনুসরণীয় ব্যক্তি হয়, আর তার দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-চেতনা ভ্রান্ত হয়, তাহলে মানুষের সামনে তার ভ্রান্ত চিন্তা তুলে ধরা যাবে, যাতে মানুষ ঐ ব্যক্তির বিভ্রান্তিপূর্ণ চিন্তা-চেতনার শিকার হয়ে পথভ্রষ্ট না হয়। এটা শরিয়তের দৃষ্টিতে গীবত হবে না; বরং মানুষের দ্বীনের হিফাজতের জন্য ভারসাম্য বজায় রেখে ঝগড়া-বিবাদ থেকে বেঁচে থেকে, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও সর্বসাধারণের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করে সেই ব্যক্তির বিভ্রান্তিমূলক চিন্তাধারা সম্পর্কে আলোচনা করা এক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় প্রয়োজন। ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) 'রিয়াজুস সালেহীন' কিতাবে এবং ইমাম গাজ্জালী (রাহিমাহুল্লাহ) 'ইহইয়া' কিতাবে লিখেছেন, ধর্মীয় উদ্দেশ্যে একজন জীবিত বা মৃত ব্যক্তির গীবত করা বৈধ। বিশেষত যখন এছাড়া বিকল্প কোনো পথ থাকে না। আর ছয় স্থানে এই বৈধতা দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে চতুর্থ নম্বর হলো– কোনো ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে মুসলমানদের হিফাজত করা এবং তাদের নসিহত করা। আর ৫ম নম্বর হলো– যদি সেই ব্যক্তি নিজেই নিজের বিদআত প্রকাশ করে, তাহলে শুধু ততটুকু মানুষের সামনে বলা যাবে, যতটুকু ঐ ব্যক্তি প্রকাশ করেছে। এর বেশি তার কোনো দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করবে না। এছাড়া এ বিষয়ে প্রমাণ রয়েছে, 'মাওয়ুয়াহ ফিকহিয়া কুয়েতিয়্যাহ' ৩১ নম্বর খণ্ডের ৩৩৫ ও ৩৩৬ পৃষ্ঠায় আদ-দুররুল মুখতারেও এ সম্পর্কিত প্রমাণ রয়েছে (খণ্ড: ৯, পৃ. ৫৮৬, মাকতাবায়ে জাকারিয়া, দেওবন্দ)। এছাড়া স্রেফ ইসলাহের উদ্দেশ্যেও নেকির আশায় জনকল্যাণার্থে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমালোচনা করা যায়। যা 'আমলের ক্ষেত্রে গীবত নয়; বরং সত্য তুলে ধরা। যেমন- (১) অত্যাচারীর অত্যাচার প্রকাশ করার জন্য। (২) সমাজ থেকে অন্যায় দূর করা এবং পাপীকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সাহায্য করা। (৩) হাদীসের সনদ যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে। (৪) মুসলমানদেরকে পাপাচার থেকে সতর্ক করার জন্য। (৫) পাপাচার ও বিদআত থেকে সাবধান করার জন্য। (৬) প্রসিদ্ধ নাম বলে তাকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য।[৭৩]

সর্বোপরি, কেউ বিয়ের উদ্দেশ্যে কারও কাছে পাত্র বা পাত্রীর সম্পর্কে কোনো জিজ্ঞাসা করে জানতে চায়, তাহলে নিয়ম হলো দোষ-ত্রুটি থাকলে তা বলে দেয়া, তা গীবত হবে না। কারণ ঐ পাত্র বা পাত্রীর দোষ এখন না বললেও বিয়ের পরে যখন প্রকাশ পাবে তখন দাম্পত্য জীবনে অনেক ফিৎনা-ফাসাদ ও ঝগড়া-বিবাদ হতে পারে। আল্লাহ বলেন,

﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾

অর্থাৎ- "মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ পছন্দ করেন না; তবে যার ওপর যুল্‌ম করা হয়েছে, আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[৭৪] অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾

"যদি তোমরা প্রতিশোধ নিতে চাও, তবে তোমাদের ওপর যে পরিমাণ যুল্‌ম করা হয়েছে, তোমরা ঠিক ততটুকুই প্রতিশোধ নিতে পারো।"[৭৫]

---

[৬৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬০৪৫।*
[৭০] *সূরা আল হুজুরা-ত : ১২।*
[৭১] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৪৪৮।*
[৭২] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ২৫৭০৮।*
[৭৩] *রিয়াদুস সালেহীন- নববী, ২৫৬ অনু., পৃ. ৫৭৫; মুসলিম- হা. ২৫৮৯, অনু. গীবত হারাম হওয়া, নববীর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*
[৭৪] *সূরা আন্ নিসা : ১৪৮।*
[৭৫] *সূরা আন্ নাহল : ১২৬।*

তবে প্রতিশোধ গ্রহণ করার ক্ষমতা ও অধিকার থাকা সত্ত্বেও যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং ক্ষমা করে দাও, তবে নিঃসন্দেহে তা তোমাদের জন্য অতি উত্তম। মোটকথা, আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, মযলুম ব্যক্তি যদি অত্যাচারীর অন্যায়-অত্যাচারের কাহিনী লোকদের কাছে প্রকাশ করে বা আদালতে অভিযোগ করে, তবে তা হারাম গীবতের আওতায় পড়বে না। কারণ যালিম নিজেই মযলুমকে অভিযোগ উত্থাপন করতে সুযোগ করে দিয়েছে; বরং বাধ্য করেছে।

গীবতের ভয়াবহ পরিণতি: গীবত সমাজ বিধ্বংসী মারাত্মক এক গুনাহ। ইসলামে গীবত বা পরনিন্দা করাকে সম্পূর্ণরূপে হারাম বলে ঘোষণা করে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সুতরাং গীবত যে রকম পাপ, শ্রবণ করাও তেমনি পাপ। অথচ এই পাপের কাজটি চায়ের আসর থেকে শুরু করে স্বাভাবিক আলাপচারিতায় যেন স্বভাবসুলভ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলা যায়, এখন তো কোনো বৈঠক গীবত ছাড়া যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অনেকেই তো পরনিন্দাকে পাপ বা নিষিদ্ধ কোনো কিছু বলে মনেই করেন না। অথচ গীবত একটি জঘন্যতম পাপ। মদপান, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার ইত্যাদি থেকেও মারাত্মক ও নিকৃষ্টতম। কেননা এসব পাপ তাওবার দ্বারা ক্ষমা পাওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু গীবতকারীর পাপ শুধু তাওবাহ্ করলেই তা মাফ হবে না; বরং যার বিরুদ্ধে গীবত করা হয়েছে সে ব্যক্তি যদি মাফ করে তাহলেই মহান আল্লাহর কাছে মাফ পাওয়া যাবে। ৬ হিজরি সনে বনু মুস্তালিক যুদ্ধে রাসূল (ﷺ)-এর সাথে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'ও ছিলেন। যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে তাঁর গলার হার হারিয়ে যায়। হারানো হার খুঁজতে গিয়ে তিনি কাফেলা থেকে পিছন পড়ে যান। ফিরতে দেরি হয়ে যায়। এ সুযোগে মুনাফিক্ব তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করল। এতে তিনি চরম মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। তাঁর জীবন একেবারে বিষন্ন হয়ে ওঠে। কিন্তু তিনি ধৈর্য হারাননি। মহান আল্লাহর ওপর আস্থা রেখে অটল ছিলেন। এ সময় রাসূল (ﷺ)'ও কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি। তিনি চিন্তিত হলেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র পিতামাতাও চরম উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্যে কালাতিপাত করছিলেন। অবশেষে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র পবিত্রতা বর্ণনা করে সূরা আন্ নূর-এর ১১-২১ নং আয়াত নাজিল হলো। এ ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাকে 'আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সুলুম বলে ডাকা হয়ে থাকে। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র ওপর মিথ্যা অপবাদকে هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ অর্থাৎ- 'এটা সুস্পষ্ট অপবাদ' বলে আল্লাহ তা'আলা আখ্যায়িত করেছেন।[৭৬] মানুষকে রকমারি ঘৃণ্য উপাধিতে ভূষিত করার মাধ্যমে তাকে বিদ্রূপ, উপহাস, হেয়প্রতিপন্ন করা ও দোষারোপ করা হয়ে থাকে। আর প্রত্যেক মু'মিনের এটা কর্তব্য যে, তার দ্বীনী ভাইকে এ ধরনের উপাধির মাধ্যমে লাঞ্ছিত না করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾

অর্থাৎ- "হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাকো; কারণ কোনো কোনো অনুমান পাপ এবং তোমরা একে অন্যের গোপণীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অন্যের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে করো। আর তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো; নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাহ্ গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।"[৭৭]

এভাবে কুরআন মানুষের মনকে খারাপ ধারণার নোংরামি থেকে পবিত্র করেছে, যাতে সে পাপে লিপ্ত হওয়া ও সন্দেহ-সংশয় থেকে মুক্ত থাকতে পারে। ইসলামী সমাজের প্রত্যেক মানুষের মনে শুধু তার ভাই-এর প্রতি ভালোবাসা সংশয়হীনতা ও পরিপূর্ণ মানসিক স্বস্তি বিরাজ করবে। যাবতীয় কুধারণামুক্ত একটি সমাজে যে কত শান্তিময় ও আনন্দময় হতে পারে, তা সত্যিই অভাবনীয়। মানুষের হৃদয় ও বিবেককে ইসলাম শুধু যে কুধারণামুক্ত থাকার প্রশিক্ষণ দিয়েই ক্ষান্ত থাকছে, তা নয়; বরং এই শিক্ষাকে সামাজিক আচরণের ভিত্তি এবং একটি পরিচ্ছন্ন সমাজে সহাবস্থানের একটি মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে সমাজের কাউকে নিছক ধারণার বশে পাকড়াও করা যাবে না। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "তোমরা কু-ধারণা হতে বেঁচে থাকো, কু-ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। তোমরা কারো গোপন তথ্য সন্ধান করো না, একে অপরের বুযুর্গী লাভ করার চেষ্টায় লেগে থেকো না, হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না এবং সবাই মিলে তোমরা মহান আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই হয়ে যাও।"[৭৮] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "তোমরা একে অপরের সাথে মতবিরোধ করো না, একে অপরের সাথে মেলামেশা পরিত্যাগ করো না, একে অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না; বরং মহান আল্লাহর বান্দারা সবাই মিলে ভাই ভাই হয়ে যাও। কোনো মুসলমানের জন্যে এটা বৈধ নয় যে, সে তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি কথাবার্তা বলা ও মেলামেশা করা পরিত্যাগ করে।"[৭৯]

[৭৬] *সূরা আন্ নূর : ১২।*

[৭৭] *সূরা আল হুজুরা-ত : ১২।*

[৭৮] *সহীহুল বুখারী।*

[৭৯] *সহীহ মুসলিম ও জামে' আত্ তিরমিযী।*

যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোককে ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র নিকট আনয়ন করা হয় এবং তাঁকে বলা হয়, এটা অমুক ব্যক্তি, এর দাঁড়ি হতে মদের ফোটা পড়ছে। তখন ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: আমাদের কারো গোপন বিষয় সন্ধান করতে নিষেধ করা হয়েছে। যদি আমাদের সামনে কারো কোনো বিষয় প্রকাশ হয়ে পড়ে তবে আমরা তাকে ঐ জন্যে পাকড়াও করতে পারি।"[৮০]

বর্ণিত আছে যে, উকবার লেখক দাজীন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র নিকট আবুল হায়সাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) গেলেন এবং তাঁকে বললেন: আমার প্রতিবেশীদের কতক মদ্যপায়ী রয়েছে। আমার মনে হচ্ছে যে, আমি পুলিশ ডেকে তাদেরকে ধরিয়ে দেই। দাজীন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: না, না, এ কাজ করো না; বরং তাদেরকে বুঝাও, উপদেশ দাও। আর তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে থাকো। কিছুদিন পর আবুল হায়সাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দাজীন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র নিকট আবার আসলেন এবং তাঁকে বললেন: আমি কোনোক্রমেই তাদেরকে মদ্যপান হতে বিরত রাখতে পারলাম না। সুতরাং এখন অবশ্যই আমি পুলিশকে ডেকে এনে তাদেরকে ধরিয়ে দিবো। দাজীন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমি তোমাকে এ কাজ না করতে অনুরোধ করছি। জেনে রেখো যে, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন করে রাখে সে এতো বেশি পুণ্য লাভ করে যে, সে যেন কোনো জীবন্ত প্রোথিতকৃতা মেয়েকে বাঁচিয়ে নিলো।" (এটা ইমাম আহমাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন)। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী (ﷺ)-কে বলেন: "সুফিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তো এরূপ এরূপ অর্থাৎ- বেঁটে!" তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে বলেন: "তুমি এমন কথা বললে যে, যদি তা সমুদ্রের পানিতে মিলানো যায় তবে তা সমুদ্রের সমস্ত পানিকে নষ্ট করে দিবে।" 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) অন্য একটি লোক সম্বন্ধে এই ধরনের কথা বললে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: "আমি এটা শুনতে পছন্দ করি না যদিও এতে আমার বড় লাভ হয়।"[৮১] গীবতের পরিণাম মদপান ও ব্যভিচারের চেয়েও কঠিন। কারণ, মদপান ও ব্যভিচার নিরেট মহান আল্লাহর হক্ব সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ তা'আলা যদি চান তাকে ক্ষমা করে দেবেন তাহলে তিনি তাকে তাওবাহ্ করার তাওফীক্ব দিবেন এবং তার অন্তরে অনুশোচনার আগুন প্রজ্জলিত করে দেবেন। কিন্তু কারও গীবত করা হলো বান্দার হক্ব সংশ্লিষ্ট। গীবতের দ্বারা বান্দার হক্ব বিনষ্ট হয়। আর বান্দার হক্ব বান্দা যদি ক্ষমা না করে হাজার বারও তাওবাহ্ করে, তবুও এ গুনাহ ক্ষমা পাওয়া যাবে না। রাসূল (ﷺ) মি'রাজের রজনীতে গীবতকারীদের করুণ পরিণতি দেখে এসে সাহাবায়ে কিরামের সামনে তা বর্ণনা করেছেন। আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'মি'রাজ রজনীতে আমাকে যখন উপরে নিয়ে যাওয়া হলো আমি এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম যাদের নখ ছিল তামা দ্বারা নির্মিত। তারা নখ দ্বারা তাদের চেহারায় আঁচড় কাটছিল, আর বুকে খামচাচ্ছিল। আমি জিবরা-ঈলকে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তিনি উত্তরে বললেন, এরা ঐসব লোক যারা মানুষের মাংস খেত (অর্থাৎ- গীবত করত) এবং সম্মানে আঘাত হানত।'[৮২] গীবতের ভয়াবহতা বুঝানোর জন্যেই বহু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেন:

«اَلْغِيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا».

অর্থাৎ- "গীবত করা যিনা থেকেও মারাত্মক।"[৮৩]

অতএব বুঝা গেল যিনা করলে যে গুনাহ হয় এর চাইতে বেশি গুনাহ হয় গীবত করলে। হিংসা-বিদ্বেষ থেকেই একে অপরের গীবত করে। আমাদের মনে রাখতে হবে হিংসা-বিদ্বেষ একটি ভয়ানক সংক্রামক ব্যাধি। মানুষের হীন মনমানসিকতা, ঈর্ষাপরায়ণতা, সম্পদের মোহ, পদমর্যাদার লোভ-লালসা থেকে হিংসা-বিদ্বেষের উৎপত্তি ও বিকাশ হয়। হিংসা-বিদ্বেষ মু'মিনের সৎ কর্ম ও পুণ্যকে তার একান্ত অজান্তে কুরে কুরে খেয়ে ফেলে। মানুষ হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, শঠতা-কপটতা, অশান্তি, হানাহানি প্রভৃতি সামাজিক অনাচারের পথ পরিহার করে পারস্পরিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবে এবং ইসলামের পরিশীলিত জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ হবে এটিই ইসলামের মূলকথা। তাই নবী কারীম (ﷺ) সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন, 'তোমরা হিংসা-বিদ্বেষ থেকে নিবৃত থাকবে। কেননা, হিংসা মানুষের নেক 'আমল বা পুণ্যকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে, যেভাবে আগুন লাকড়িকে জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে দেয়।'[৮৪] কু-ধারণা থেকেও মানুষ একে অপরের গীবত করে। আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

অর্থাৎ- "তোমার যে বিষয়ে জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না। অবশ্যই কান, চোখ ও হৃদয় এগুলোর প্রতিটি সম্পর্কে (কিয়ামতের দিন) কৈফিয়ত তলব করা হবে।"[৮৫]

বর্তমানে একটি বড় সমস্যা হলো– না জেনে কথা বলা, অমূলক সন্দেহ করা, আপনজনের কথা বাছ-বিচার ছাড়াই বিশ্বাস করা ইত্যাদি। অথচ সমাজে এমন বহু কথা ছড়িয়ে পড়ে, যার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। এ ধরনের ভিত্তিহীন

[৮০] *সুনান আবূ দাউদ।*
[৮১] *সুনান আবূ দাউদ।*
[৮২] *আবূ দাউদ- ৪৮৭৮, ৪৮৭৯; আহমাদ- হা. ১৩৩৪০।*
[৮৩] *মিশকা-তুল মাসা-বীহ; বায়হাক্বী।*
[৮৪] *সুনান আবূ দাউদ।*
[৮৫] *সূরা বানী ইসরা-ঈল : ৩৬।*

গুজব মানুষের সম্পর্ক বিনষ্ট করে দেয়। তাই শোনা কথার সত্যতা যাচাই করা জরুরি। ইরশাদ হয়েছে,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾

অর্থাৎ- "হে ঈমানদারগণ! যদি কোনো পাপাচারী তোমাদের কাছে কোনো বার্তা নিয়ে আসে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে। যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে যাতে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদের অনুতপ্ত হতে না হয়।"[৮৬]

যাচাই না করে কোনো খবর প্রকাশ করা ও বিশ্বাস করা মিথ্যাবাদী হওয়ার নামান্তর। জাবির ইবনু 'আব্দিল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা নবী (ﷺ)-এর সাথে (সফরে) ছিলাম এমন সময় মৃত মরা-পচা দুর্গন্ধযুক্ত বাতাস বইতে শুরু করলো। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন বললেন: "এটা কিসের দুর্গন্ধ তা তোমরা জানকি?" এটা হলো ঐ লোকদের দুর্গন্ধ যারা মানুষের গীবত করে।" (এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন)। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, মায়েয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমি ব্যভিচার করে ফেলেছি।" রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এমনকি মায়েয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) চারবার একথার পুনরাবৃত্তি করলেন। পঞ্চমবারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কি সত্যিই ব্যভিচার করেছো?" উত্তরে তিনি বললেন: "জী, হ্যাঁ।" রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পুনরায় তাঁকে প্রশ্ন করলেন: "ব্যভিচার কাকে বলে তা তুমি জানো কি?" জবাবে তিনি বললেন: "হ্যাঁ, মানুষ তার হালাল স্ত্রীর সাথে যা করে আমি হারাম স্ত্রীলোকের সাথে ঠিক তাই করেছি।" রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রশ্ন করলেন: "এখন তোমার উদ্দেশ্য কি?" আমার উদ্দেশ্য এই যে, আমাকে আপনি এই গুনাহ হতে পবিত্র করবেন।" জবাব দিলেন তিনি। "তুমি কি তোমার গুপ্তাঙ্গকে এরূপভাবে প্রবেশ করিয়েছিলেন যেরূপভাবে শলাকা সুরমাদানীর মধ্যে এবং কাষ্ঠ কুঁয়ার মধ্যে প্রবেশ করে?" প্রশ্ন করলেন তিনি। "হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! হ্যাঁ, এই ভাবেই।" তিনি উত্তর দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে রজম করার অর্থাৎ- অর্ধেক পুঁতে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করার নির্দেশ দেন এবং এভাবেই তাঁকে হত্যা করা হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দু'টি লোককে পরস্পর বলাবলি করতে শুনলেন: "এ লোকটিকে দেখো, আল্লাহ তা'আলা তার দোষ গোপন করে রেখেছিলেন, কিন্তু সে নিজেই নিজেকে ছাড়লো না, ফলে কুকুরের মতো তাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা হলো।" রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একথা শুনে বলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি দেখলেন যে, পথে একটি মৃত গাধা পড়ে রয়েছে। তিনি বললেন: "অমুক অমুক কোথায়?" তারা আসলে তিনি বললেন: তোমরা সওয়ারী হতে অবতরণ কর এবং এই মৃত গাধার মাংস ভক্ষণ কর!" তারা বললো: "হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ক্ষমা করুন, এটা কি খাওয়ার যোগ্য?" উত্তরে তিনি বললেন: "তোমরা তোমাদের (মুসলমান) ভাইয়ের যে দোষ বর্ণনা করছিলে ওটা এর চেয়েও জঘন্য ছিল। যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! সে [অর্থাৎ- মায়েয (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তো এখন জান্নাতের নদীতে সাঁতার দিচ্ছে।" [হাদীসটি হাফিয আবূ ইয়ালা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটির ইসনাদ বিশুদ্ধ] আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'একদা রাসূল (ﷺ) সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো সর্বধিক নিঃস্ব ব্যক্তি কে? সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমরা তো তাকেই নিঃস্ব লোক বলে মনে করি, যার দিরহাম (টাকা-পয়সা) ও ধন-সম্পদ থাকে না। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন, আমার উম্মাতের মধ্যে প্রকৃত নিঃস্ব ব্যক্তি হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন সালাত, সিয়াম ও যাকাতের বিশাল পুণ্য ভাণ্ডার নিয়ে উপস্থিত হলেও সে হাশ্‌রের ময়দানে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, হয় সে কাউকে গালি-গালাজ করেছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে বা কারো-সম্পদ অন্যায়ভাবে আহরণ এবং ভক্ষণ করেছে। কাউকে মারপিটের মাধ্যমে তার রক্ত প্রবাহিত করেছে, কাউকে অন্যায়ভাবে চড়-থাপ্পড় দিয়ে এসেছে। যেহেতু কিয়ামতের দিনটি হবে চূড়ান্ত ফায়সালা ও বিচারের দিন। তাই এ ব্যক্তির ফায়সালা এভাবে হবে যে, সে যাদের হক্ব নষ্ট করেছে এবং নানাভাবে উৎপীড়ন করেছে তাদের মধ্যে তার পুণ্য বন্টন করে দেয়া হবে। তাদের দাবি পূরণ হওয়ার পূর্বেই যদি তার পূণ্যের ভাণ্ডার শেষ হয়ে যায়, তখন দাবিদার ও পাওনাদারদের পাপ এনে তার মাথায় চাপান হবে, অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[৮৭]

পরিশেষে বলা যায়, আমাদের পুরোপুরি ধর্মীয় জ্ঞান না থাকার কারণে দৈনন্দিন কতই না পরনিন্দা করে যাচ্ছি। আর এ নিন্দার মাধ্যমে পরস্পরের দোষচর্চা হয়ে থাকে বলে তাকে কেন্দ্র করে প্রতিনিয়তই জন্ম নিয়েছে হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা আর তা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে ঝগড়া-বিবাদ, হানাহানিসহ বিভিন্ন ফিৎনা-ফাসাদ। এর মাধ্যমে পরস্পরের আত্মবিশ্বাস ও সহমর্মিতা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। শত্রুরা বৃদ্ধি পাচ্ছে সমাজে এর ফলে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে হয়ে ওঠে অশান্ত ও গ্লানিকর। অতএব, আমাদের সবার উচিত অন্যের দোষ-ত্রুটি অপরের কাছে আলোচনা না করে নিজের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করে তা সংশোধন করতে সচেষ্ট থাকা। তাহলে পরনিন্দা করার আর কোনো সুযোগ থাকবে না। ❑

[৮৬] *সূরা আল হুজুরা-ত : ৬।*

[৮৭] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৩৬০।*

সমাজ গঠনে নেতৃত্বের অবদান

–ডা. সুলতান আহমদ★

পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রকে সুচারুরূপে সাজানো, গোছানো ও পরিচালনা করার জন্য সৎ চরিত্রবান, সাহসী, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্বের প্রয়োজন। যেখানে এসব গুণের নেতৃত্ব দৃশ্যমান, সেখানে কখনই ব্যার্থতা আনতে পারে না। নেতৃত্ব চেয়ে নিতে নেই। নেতৃত্ব চেয়ে নিলে অকল্যাণ বয়ে আনে। মহান আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হতে হয়। পরকালেও হতে হবে লাঞ্চিত। মু'মিন ব্যক্তি নেতৃত্বের প্রতি অনাগ্রহশীল থাকবেন। আল্লাহ তা'আলা যাঁকে চান তাঁর ওপর নেতৃত্বদান করে থাকেন। বর্তমানে সততার বড়ই অভাব। নেতৃত্বদানে আল্লাহ ভীতি ক'জনারই বা আছে। কিয়ামত হবে, পরকালের যাররা যাররা হিসাব নেয়া হবে তার কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। ভাবতে আশ্চর্য লাগে। মনে হচ্ছে "উলট পালট করে দেমা লুটেপুটে খাই"। খাও দাও ফুর্তি করে দুনিয়ার মজা লুটে নাও। যার ফলে বিগত শাসকদের ভয়াবহ, ন্যাক্কারজনক পরিণতির স্বীকার হতে হলো। জাতিগ্রহণ করল মহাশক্তির অক্সিজেন। থলের বিড়াল বেরিয়ে এলো। টাকার খনি দৃশ্যমান হলো। নিয়োগ বাণিজ্য, পদায়ন বাণিজ্য, কমিশন বাণিজ্য, সিন্ডিগেট বাণিজ্য আরও কত বাণিজ্যের মাইর প্যাঁচে সোনার বাংলা হয়েছিল বাকরুদ্ধ। নেতৃত্বে যাঁরাই আশীন হোক না কেন তাদের স্মরণে রাখতে হবে অতীতে যালিম, দুর্নীতিবাজ শাসকদের করুণ কাহিনীর ইতিহাস। তাহলে চর্বিত চর্বণ হবে না।

আসুন আমরা হাদীসের আলোকে নেতৃত্বের বিষয়ে জানার চেষ্টা করি।

১. আর মানবসমাজ খনির মতো। জাহেলি যুগের উত্তম ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পরও উত্তম যদি তারা দ্বীনী ইল্‌ম অর্জন করে। তোমরা নেতৃত্ব ও শাসনের ব্যাপারে ঐ লোককেই সবচেয়ে উত্তম পাবে যে এর প্রতি অনাসক্ত, যে পর্যন্ত না সে তা গ্রহণ করে।[৮৮]

২. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যখন আমানত নষ্ট হয়ে যাবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করবে। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমানত কীভাবে নষ্ট হয়ে যাবে? তিনি বললেন, যখন কোনো দায়িত্ব অযোগ্য ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করা হবে, তখনই কিয়ামতের অপেক্ষা করবে।[৮৯]

৩. হাসান বসরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মাকিল ইবনু ইয়াসারের মৃত্যুশয্যায় তাকে দেখতে গেলেন। তখন মাকিল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করছি যা আমি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে শুনেছি। আমি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে শুনেছি যে, কোনো বান্দাকে যদি আল্লাহ তা'আলা জনগণের নেতৃত্ব প্রদান করেন, আর সে কল্যাণ কামনার সঙ্গে তাদের তত্ত্বাবধান না করে, তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।[৯০]

৪. 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং নিজ অধীনস্থদের বিষয়ে সে জিজ্ঞাসিত হবে। ইমাম (শাসক) একজন দায়িত্বশীল। কাজেই আপন অধীনস্থদের বিষয়ে সে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। কাজেই সে তার অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল। কাজেই সে তার অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে, আর খাদেম তার মনিবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কাজেই সে তার দায়িত্বাধীন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে এদের সম্পর্কে (নিশ্চিতভাবেই) শুনেছি। তবে আমার ধারণা; নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেছেন, তার সন্তান তার পিতার সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কাজেই তার দায়িত্বাধীন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। মোটকথা তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।[৯১]

৫. 'আব্দুর রহমান ইবনু সামুরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বলেছেন: হে 'আব্দুর রহমান ইবনু সামুরাহ্! তুমি নেতৃত্ব চেও না। কারণ চাওয়ার পর যদি তোমাকে তা দেয়া হয়, তবে তার দায়িত্ব তোমার ওপরই বর্তাবে। আর যদি চাওয়া ছাড়াই

★ *উপ-পরিচালক (অব.), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সাবেক সাংবাদিক ও সমাজ সংগঠক।*

[৮৮] *সহীহুল বুখারী- ৪/৩৪৯৬।*

[৮৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৮/৬৪৯৬।*

[৯০] *সহীহুল বুখারী- হা. ৯/৭১৫০।*

[৯১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪/২৫৫৮।*

তা তোমাকে দেয়া হয় তবে এ ক্ষেত্রে তোমাকে সাহায্য করা হবে। আর কোনো বিষয়ে কসম করার পর, তার বিপরীত দিকটিকে যদি তার চেয়ে কল্যাণকর মনে করো, তাহলে কসমের কাফফারাহ আদায় করো এবং কল্যাণকর কাজটি বাস্তবায়িত করো।[৯২]

৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন: তোমরা নিশ্চয়ই নেতৃত্বের লোভ করো, অথচ কিয়ামতের দিন তা লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কত উত্তম দুগ্ধদায়িনী এবং কত মন্দ দুগ্ধ পানে বাধা দানকারিণী অর্থাৎ- এর প্রথম দিকে দুগ্ধদানের মতো তৃপ্তিকর, আর পরিণাম দুধ ছাড়ানোর মতো যন্ত্রণাদায়ক।[৯৩]

৭. আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, আমি ও আমার কৃওমের দু'ব্যক্তি নবী (ﷺ)-এর কাছে আসলাম। সে দুজনের একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে (কোনো বিষয়ে) আমীর নিযুক্ত করুন। অন্যজনও ঐরূপ কথা বলল। তখন তিনি বললেন: যারা নেতৃত্ব চায় এবং এর লোভ করে, আমরা তাদেরকে এ পদে নিয়োগ করি না।[৯৪]

বর্ণিত হাদীসের আলোকে যদি নেতৃত্ব দেয়া হয় তাহলে মহান আল্লাহর সাহায্য ও রহমত প্রাপ্য হবে। রাষ্ট্রের সর্বত্রই শান্তি বিরাজিত থাকবে। অপকর্ম হবে না। ইনসাফ কায়েম হবে। কারও হক্ব নষ্ট হবে না। কারও প্রতি যুল্‌ম নেমে আসবে না। হবে না সমাজ বাকরুদ্ধ। তাই নেতৃত্ব চেয়ে নেয়া, জোর করে ক্ষমতায় বসা বা ক্ষমতায় থাকা যুল্‌মের শামিল। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যাঁর প্রতি নেতৃত্বদান করা হয়, তাঁর উচিত হবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা।

শিক্ষাণীয় দিক

(১) আল্লাহ যাকে নেতৃত্ব দিবেন তিনিই নেতা হবেন।
(২) বলপূর্বক নেতা হওয়া জাতির জন্য অশান্তির কারণ।
(৩) নেতৃত্ব মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হলে কল্যাণ প্রাপ্ত হবে।
(৪) স্বৈরাচারী হওয়া যাবে না।
(৫) প্রত্যেক উর্ধ্বতনকে প্রত্যেক অধীনস্থদের হিসাব দিতে হবে। ❑

[৯২] *সহীহুর বুখারী-হা. ৯/৭১৪৬।*
[৯৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৯/৭১৪৮।*
[৯৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৯/৭১৪৯।*

সাত রীতিতে কুরআন পাঠের ঘটনা

[২৯ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

তখন রাসূল (ﷺ) তাদের দু'জনকে বলেন, "আপনারা পড়ুন তো।" অতঃপর তারা পড়লেন।

রাসূল (ﷺ) শুনে বললেন, "আপনারা ভালো পড়েছেন। [রাবীর সন্দেহ অথবা রাসূল (ﷺ)] আপনারা সঠিক পড়েছেন।"

উবাই ইবনু ক্বা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "রাসূল (ﷺ) যখন তাদেরকে এরকম কথা বললেন, তখন ব্যাপারটি আমার কাছে খুবই কষ্টদায়ক হলো। যে অস্থিরতা আমাকে পরিবেষ্টন করেছে।

রাসূল (ﷺ) যখন তা বুঝতে পারলেন, তখন তিনি আমার বুকে হাত দিয়ে আঘাত করলেন, তাতে ভয়ে আমার অবস্থা এমন হলো যেন আমি আমার প্রতিপালককে দেখতে পেলাম!"

তিনি আমাকে বললেন, "হে উবাই ইবনু ক্বা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু), নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আমার কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন, "আপনি এক রীতিতে কুরআন পাঠ করুন।"

আমি তাঁর কাছে পুনরায় আবদার করলাম, "আপনি আমার উম্মাতের ওপর সহজ করে দিন।" আমি এটি দু'বার বললাম।

তখন তিনি জবাব দিলেন, "আপনি সাত রীতিতে কুরআন পাঠ করুন। আর আমার প্রতিটি জবাবের বদৌলতে কিয়ামতের দিন আপনার জন্য একটি করে চাওয়া (পূরণ)-এর সুযোগ থাকবে।"

আমি বললাম, "হে আল্লাহ! আপনি আমার উম্মতকে ক্ষমা করে দিন।" আর আরেকটি চাওয়া আমি রেখে দিয়েছি সেই দিনের জন্য যেদিন সৃষ্টিজীব আমার কাছে তা প্রত্যাশা করবে, এমনকি ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)'ও।"[৯৫]

হাদীসের শিক্ষা

উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে সহজ করে দিয়েছেন এবং সাত রীতিতে পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। ❑

[৯৫] *সহীহ ইবনু হিব্বান- হা. ৭৩৭; মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ- ১০/৫১৬; মুসলিম- হা. ৮২০; মুসনাদ আহমাদ- ৫/১২৭; শারহুস সুন্নাহ- বাগাবী, ১২২৭; তাবারী- ৩০।*

সাত রীতিতে কুরআন পাঠের ঘটনা

–আবূ তাহসীন মুহাম্মদ*

উবাই ইবনু ক্বা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "জিব্‌রা-ঈল (আলাইহিস সালাম) নবী (ﷺ)-এর কাছে আসেন, সে সময় তিনি বানী গিফার গোত্রের এলাকায় ছিলেন। জিব্‌রা-ঈল (আলাইহিস সালাম) তাঁকে বলেন, "হে মুহাম্মাদ (ﷺ), নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আপনি আপনার উম্মতকে এই কুরআন এক রীতিতে পাঠ করে শুনাবেন।"

তখন রাসূল (ﷺ) বলেন, "আমি মহান আল্লাহর কাছে সুস্থতা, নিরাপত্তা ও ক্ষমা চাই [রাবী বলেন, "অথবা রাসূল (ﷺ) বলেছেন,] আমি মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য, সুস্থতা ও নিরাপত্তা চাই। আপনি তাঁর কাছে একটু সহজতা প্রার্থনা করুন। কেননা তারা এটা পারবে না।"

অতঃপর জিব্‌রা-ঈল (আলাইহিস সালাম) (মহান আল্লাহর কাছে) চলে গেলেন তারপর আবার ফিরে আসলেন এবং বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আপনি আপনার উম্মতকে এই কুরআন এক রীতিতে পাঠ করে শুনাবেন।" তখন রাসূল (ﷺ) বলেন, "আমি আল্লাহর কাছে তাঁর সুস্থতা, নিরাপত্তা ও ক্ষমা চাই, রাবী বলেন, "অথবা রাসূল (ﷺ) আমি মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য, সুস্থতা ও নিরাপত্তা চাই। আপনি তাঁর কাছে একটু সহজতা প্রার্থনা করুন। কেননা তারা এটা পারবে না।" অতঃপর জিব্‌রা-ঈল (আলাইহিস সালাম) (মহান আল্লাহর কাছে) চলে গেলেন তারপর আবার ফিরে আসলেন এবং বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আপনি আপনার উম্মতকে এই কুরআন দুই রীতিতে পাঠ করে শুনাবেন।" তখন রাসূল (ﷺ) বলেন, "আমি মহান আল্লাহর কাছে সুস্থতা, নিরাপত্তা ও ক্ষমা চাই, [রাবী বলেন, "অথবা রাসূল (ﷺ) বলেছেন,] আমি মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য, সুস্থতা ও নিরাপত্তা চাই। আপনি তাঁর কাছে একটু সহজতা প্রার্থনা করুন। কেননা তারা এটা পারবে না।"

অতঃপর জিব্‌রা-ঈল (আলাইহিস সালাম) (মহান আল্লাহর কাছে) চলে গেলেন তারপর আবার ফিরে আসলেন এবং বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আপনি আপনার উম্মতকে এই কুরআন তিন রীতিতে পাঠ করে শুনাবেন।"

তখন রাসূল (ﷺ) বলেন, "আমি মহান আল্লাহর কাছে সুস্থতা, নিরাপত্তা ও ক্ষমা চাই, [রাবী বলেন, "অথবা রাসূল (ﷺ) বলেছেন,] আমি মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য, সুস্থতা ও নিরাপত্তা চাই। আপনি তাঁর কাছে একটু সহজতা প্রার্থনা করুন। কেননা তারা এটা পারবে না।"

অতঃপর জিব্‌রা-ঈল (আলাইহিস সালাম) (মহান আল্লাহর কাছে) চলে গেলেন তারপর আবার ফিরে আসলেন এবং বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আপনি আপনার উম্মতকে এই কুরআন সাত রীতিতে পাঠ করে শুনাবেন। কাজেই যে ব্যক্তি এই সাত রীতির যে কোনো এক রীতিতে কুরআন পাঠ করবে, সে ব্যক্তি যথাযথভাবেই কুরআন পাঠ করলো।"[৯৬]

একই মর্মে উবাই ইবনু ক্বা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আরো বলেন, "আমি মসজিদে বসে ছিলাম, এসময় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে কিছু আয়াত এমনভাবে পাঠ করেন, যা আমি প্রতিবাদ করি। তারপর আরেক ব্যক্তি প্রবেশ করে, অতঃপর সে পূর্বের ব্যক্তি থেকে ভিন্ন রীতিতে কিছু আয়াত পাঠ করেন। যখন তিনি সালাত শেষ করেন, তখন তারা দুইজনই রাসূল (ﷺ)-এর কাছে প্রবেশ করেন।

তখন আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! এই ব্যক্তি এমনভাবে কিরআত পড়েছেন, যা আমি প্রতিবাদ করেছি। তারপর তার সঙ্গী আরেক রীতিতে আয়াত পাঠ করেছেন।" *[পরবর্তী অংশ ২৮ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

* *আটমুল, শিবগঞ্জ, বগুড়া।*

[৯৬] *সহীহ ইবনু হিব্বান- হা. ৭৩৫; মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ- ১০/৫১৮; মুসনাদ আহমাদ- ৫/১৩২; আত্ তায়ালিসী- ২/৮; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৯৪৪।*

বিশেষ মাসায়িল

আমরা কীভাবে নবী (ﷺ)-এর শাফা'আত লাভ করতে পারি?

"রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।" *(সূরা আল হাশ্‌র: ৭)*

আরাফাত ডেস্ক: আমরা প্রত্যেকেই চাই নবী (ﷺ)-এর শাফা'আত লাভের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত জান্নাত লাভ করতে। কিন্তু চাইলে তো আর পাওয়া যাবে না। এজন্য সর্বপ্রথম যে কাজটি করতে হবে তাহলো– নিজের জীবনকে নবী (ﷺ)-এর আনুগত্যে পুরোপুরি সমর্পণ করতে হবে। অতঃপর নিম্নবর্ণিত 'আমলসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিজেকে শাফা'আত লাভের যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে, তবেই আমরা নবী (ﷺ)-এর শাফা'আত লাভ আশা করতে পারি। বিশেষ 'আমলসমূহ–

১) একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহর 'ইবাদত করা ও তাওহীদ বাস্তবায়ন করা: আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ.

"কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত লাভে সেই ব্যক্তি সৌভাগ্য মণ্ডিত হবে, যে আন্তরিকভাবে বলবে, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' তথা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই।"[৯৭]

২) কুরআন পাঠ করা: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

اقْرَءُوْا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَصْحَابِهِ.

"তোমরা কুরআন পাঠ করো। কেননা কুরআন কিয়ামতের দিন তার পাঠকদের জন্য সুপারিশকারী হবে।"[৯৮]

৩) রোযা রাখা: 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

اَلصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيْهِ. وَيَقُوْلُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيْهِ. قَالَ فَيُشَفَّعَانِ.

"রোযা এবং কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে প্রভু! আমি তাকে দিনের বেলায় খাদ্য ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে বাধা দিয়েছিলাম। অতএব আপনি তার ব্যাপারে আমার শাফা'আত কবুল করুন। আর কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের বেলায় ঘুম থেকে বাধা দিয়েছিলাম। অতএব, তার ব্যাপারে আমার শাফা'আত কবুল করুন। অতঃপর তাদের শাফা'আত কবুল করা হবে।"[৯৯]

৪) আযানের দু'আ পাঠ করা: 'আলী ইবনু আইয়াশ (রহিমাহুল্লাহ) জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনার পর এ দু'আ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"হে আল্লাহ! এ পরিপূর্ণ আহ্বান এবং প্রতিষ্ঠিত সালাত এর প্রতিপালক, মুহাম্মদকে ওয়াসিলা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করো। প্রতিষ্ঠিত করো তাকে মাকামে মাহমুদে, যার ওয়াদা তাঁকে তুমি দিয়েছ।" কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফা'আত অনিবার্য হয়ে যাবে।

এ হাদীসটি হামযাহ্ ইবনু 'আব্দুল্লাহ তার পিতা থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন।[১০০]

---

[৯৭] *সহীহুল বুখারী- অনুচ্ছেদ : হাদীসের প্রতি আগ্রহ, হা: ৯৯, মাকতাবাতুশ্ শামেলা।*

[৯৮] *সহীহ মুসলিম।*

[৯৯] *মুসনাদ আহমাদ, মুসনাদ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র- হা: ৬৭৮৫, মাকতাবাতুশ্ শামেলা, সনদ সহীহ।*

[১০০] *সহীহুল বুখারী- বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, অধ্যায়– ৫২ : তাফসীর, হা: ৪৩৬০।*

৫) মদীনাহ মুনাওয়ারার কষ্টে ধৈর্য ধারণ করা ও সেখানে মৃত্যুবরণ করা:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ أَنَّهُ جَاءَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ لَيَالِيَ الْحَرَّةِ فَاسْتَشَارَهُ فِي الْجَلَاءِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَشَكَا إِلَيْهِ أَسْعَارَهَا وَكَثْرَةَ عِيَالِهِ وَأَخْبَرَهُ أَنْ لَا صَبْرَ لَهُ عَلَى جَهْدِ الْمَدِيْنَةِ وَلْأْوَائِهَا. فَقَالَ لَهُ وَيْحَكَ لَا آمُرُكَ بِذٰلِكَ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ «لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لأْوَائِهَا فَيَمُوْتَ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا أَوْ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا.

"ঐতিহাসিক হার্‌রার ঘটনার সময় আবূ সা'ঈদ মাওলা আল মাহরী আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট এসে মদীনা থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য পরামর্শ চাইলেন। তিনি অভিযোগ করলেন, মদীনার আসবাব-পত্র ও পণ্যের দাম বেশি এবং তার সন্তান-সন্ততির সংখ্যাও প্রচুর। এও বললেন, মদীনার এই দুঃখ ও কষ্টে ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতা তার নেই। আবূ সা'ঈদ খুদরী তাকে বললেন, আফসোস! তোমাকে এ পরামর্শ দিতে পারি না। কারণ আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি মদীনার দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশকারী বা সাক্ষী হব যদি সে মুসলিম হয়।"[১০১]

৬) অধিক পরিমাণে সাজদাহ্ দেয়া তথা নফল সালাত আদায় করা:

كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) مِمَّا يَقُوْلُ لِلْخَادِمِ: أَلَكَ حَاجَةٌ؟ قَالَ: حَتّٰى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، حَاجَتِيْ قَالَ: وَمَا حَاجَتُكَ؟ قَالَ: حَاجَتِيْ أَنْ تَشْفَعَ لِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: وَمَنْ دَلَّكَ عَلٰى هٰذَا؟ قَالَ: رَبِّيْ قَالَ: إِمَّا لَا، فَأَعِنِّيْ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ.

"নবী (ﷺ) তার খাদিমকে লক্ষ্য করে যেসব কথা বলতেন সেগুলোর মধ্যে একটি কথা হলো– "তোমার কি কোনো দরকার আছে?" একদিন তিনি তার খাদিমকে এ কথাটি বললে– খাদেম বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি জিনিস দরকার। রাসূল (ﷺ) বললেন: "তোমার কী জিনিস দরকার?" খাদেম: আপনি কিয়ামতের দিন আমার জন্য সুপারিশ করবেন। রাসূল (ﷺ): "কে তোমাকে এ বিষয়টির সন্ধান দিলো?" খাদেম: আমার প্রতিপালক। রাসূল (ﷺ): "এটাই যদি তোমার চাওয়া হয় তবে অধিক পরিমাণ সাজদাহ্ করো তথা বেশি বেশি নফল সালাত আদায়ের মাধ্যমে আমাকে (এ ব্যাপারে) সাহায্য করো।"[১০২]

এ প্রসঙ্গে আরেকটি হাদীস:

عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ (رضي الله عنه) قَالَ: كُنْتُ أَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوْئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِيْ: (سَلْ) فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: (أَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ؟) قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: (فَأَعِنِّيْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ.

রাবী'আহ্ ইবনু কা'ব আসলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ)-এর (খিদমাতের উদ্দেশ্যে) তাঁর সাথেই রাতে থাকতাম। (একদিন) আমি তাঁর জন্য ওযূর পানি ও তাঁর প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস নিয়ে তার নিকট হাজির হলে তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন: চাও। আমি বললাম: জান্নাতে আপনার সাথে থাকতে চাই। রাসূল (ﷺ) বললেন: এটা ছাড়া অন্য কিছু? আমি বললাম: এটাই আমার চাওয়া। রাসূল (ﷺ) বললেন: "তুমি এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করো অধিক পরিমাণে সাজদাহ্ করার মাধ্যমে অর্থাৎ- বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করার মাধ্যমে।[১০৩]

পরিশেষে আল্লাহর কাছে ইস্তিগফারসহ বেশি বেশি প্রার্থনা করতে হবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তার ডাকেই সাড়া দেন, যে তাঁর কাছে যাচঞা করে। ❑

---

[১০১] *সহীহ মুসলিম- অনুচ্ছেদ : মাদীনায় বসবাস করা ও সেখানকার দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ করার ব্যাপারে উৎসাহ দান, হা: ৩৪০৫, মাকতাবাতুশ্ শামেলা।*

[১০২] *মুসনাদ আহমাদ- হা: ১৬৫০২, মাকতাবাতুশ্ শামেলা।*

[১০৩] *সহীহ মুসলিম- অনুচ্ছেদ : সাজদাহ্ করার মর্যাদা ও তাতে উদ্বুদ্ধকরণ, হা: ১১২২।*

সমাজচিন্তা

ভারতের একতরফা পানি নীতি; সমাধানে আমাদের অবস্থান

–মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম*

জাতিসংঘের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে– "একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে বিশ্বের অধিকাংশ দেশে পানি সংকট দেখা দিবে। পানি সম্পদের সুষ্ঠু বন্টনের অভাবে যুদ্ধও বেঁধে যেতে পারে। বর্তমান বিশ্বের ৮০টি দেশ পানি সমস্যার সম্মুখীন। পানির জন্য সংগ্রাম করছে পৃথিবীর প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ।[১০৪]

পৃথিবীর সবচেয়ে নোংরা রাজনীতির চর্চাকারী দেশ হিন্দুত্ববাদী ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্র ভারত। বাংলাদের সার্বভৌমত্ব স্বাধীনতা কে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা এবং বাংলাদেশ যেন যুগের পর যুগ তাদের কে প্রভু হিসেবে মেনে নেয় সেজন্য তারা বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক কূটনৈতিক অপকৌশল করে থাকে। সময়ে সময়ে তারা ভৌগোলিক অবস্থান থেকে বাংলাদেশ কে চরম হুমকি এবং বিপদের মুখে ঠেলে দিতে কোনো প্রকার কুণ্ঠাবোধ করে না। ভারতের নদী নীতির অন্যতম অংশ পানি আগ্রাসন। বাংলাদেশ কৃষি নির্ভর এবং নদী মাতৃক দেশ। সবুজ শ্যামল এই উর্বর জমি তে যে সোনার ফসল ফলে এবং যে মাছ এই দেশের নদীতে পাওয়া যায় তা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে পাওয়া দুষ্কর। এমন সোনার দেশকে কৃষি সম্পদ এবং নদী মাতৃক মূল্যবান সম্পদকে বিরান করার জন্য হিন্দু রাষ্ট্র ভারত যুগের পর যুগ নির্মম সহিংসতা করছে এবং পানি আগ্রাসনের নোংরা রাজনীতির চর্চা করছে। যেটা আন্তর্জাতিক নদী নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। অথচ ভারত এই নীতি অবলম্বন করে যুগের পর যুগ সীমা লংঘন করে নির্বিচারে আমাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করছে। বিশ্ব পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বে দুই দেশের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করছে এমন নদীর সংখ্যা ২৬৩টি। যাকে পরিভাষায় বলা হয় Trans Boundary। এই সংখ্যক নদীর মধ্যে ৫৭টি নদী বাংলাদেশে অবস্থিত। এর মধ্যে ৫৪টিই ভারতের মধ্যে হয়ে বাংলাদেশ অতিক্রম করছে। এই ৫৪টির মধ্যে থেকে আবার তারা ৩৫টি নদী তথা দুই দেশের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করা নদীর (Trans Boundary) ওপর ৫০টি বাঁধ নির্মাণ করে। অথচ এই কাজ ছিল চরম মাপের হিংসাত্মক এবং বাংলাদেশের ওপর তাদের কতৃত্ব জিইয়ে রাখার অপচেষ্টা। যেটা আন্তর্জাতিক আইনের বিরোধী ছিল। অথচ এই কাজের ক্ষেত্রে উচিত ছিল দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা, সমঝোতা ভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেয়া। যেটা এক তরফা স্বৈরাচারী ভারত করেনি বরং এতে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। এই বাঁধ নির্মাণ করার কারণে বাংলাদেশ মারাত্মক পানি সংকট ও বিপদাপন্নে পতিত হয় এবং সেইসাথে কৃষি ক্ষেত, মাছ চাষে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। যেটা দিনে দিনে আবাদি জমিগুলো মরুভূমি তে পরিণত হচ্ছে।

পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিস্তা ছাড়াও অন্যান্য নদীর ওপর তাদের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার হীন রাজনৈতিক অপচেষ্টা করার পাঁয়তারা করে আসছে বহু আগ থেকে। ভারতের এমন একতরফা নীতি এবং তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়ে আমাদের ন্যায্য পানির হিস্যা চাওয়ার দাবি দলীয় নেতৃবৃন্দ বলতে চায় না। তাদের আবার অনেকেই ভারত দাদা বাবুদের জিকির করে মুখে ফেনা তুলে বলে "ভারত আমাদের বন্ধু দেশ! প্রতিবেশী দেশ। ভারত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় সহযোগিতা করেছে। তাদের ভূমিকা অনেক"।

এই দলান্ধরা বোঝার চেষ্টা করে না যে, ভারত এমনিতেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় সাহায্য করেনি বরং তারা স্বাধীন বাংলাদেশের ওপর কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং শোষণ করার লক্ষ্যে একটু সহযোগিতা করেছে। কারণ ভারত হলো সবচেয়ে স্বার্থান্বেষী রাষ্ট্র। তারা আমাদের ওপর স্বাধীনতা কে হস্তক্ষেপ করার দুরভিসন্ধি করার লক্ষ্যেই এগিয়ে এসেছে যেভাবে তারা স্বাধীন হায়দ্রাবাদ কে রাতারাতি দখলে নিয়েছে। ভারতের এই একতরফা পানি নীতি এবং অন্যায়ভাবে পানি আগ্রাসন একদিক থেকে যেমনভাবে বাংলাদেশ কে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে ঠিক তেমনি ভাবে ভারতের কাছে এদেশের মানুষ যেন আশ্রয় ভিক্ষা চায় আর এই আশ্রয় চাওয়ার ফাঁকে ভারত তাদের স্বার্থ হাসিল করতে পারে এমন সুদূরপ্রসারী অভিলাষ, পরিকল্পনা করে যাতে করে সহজেই তাদের টোপ গিলে বাংলাদেশের মানুষ। ভারতের এমন নীতিমালার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছে বিশ্বব্যাংক এবং এদেশে বসবাসকারী ভারতীয় দালাল যারা ভারত কে প্রভু হিসেবে মানে। কথায় কথায় ভারতের প্রতি মায়াকান্না, অতিভক্তি করে মূলত এরাই হলো আমাদের ঘরের শত্রু বিভীষণ।

১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এক রিপোর্টে বিশ্বব্যাংকের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ইসমাঈল সেরাজেলদিন

---

*শিক্ষক, হোসেনপুর দারুল হুদা সালাফিয়্যাহ মাদ্‌রাসা, খানসামা, দিনাজপুর।

[১০৪] বাংলাদেশ ভারত অভিন্ন নদীর পানি সংকট- আব্দুস সাত্তার, পৃ. ১৫।

বলেছিলেন, চলতি শতাব্দীতে বেশিরভাগ যুদ্ধ হয়েছে তেল নিয়ে আর আগামী শতাব্দীতে যুদ্ধ চলবে পানি নিয়ে।[১০৫]

এটা আজ চরম বাস্তবতার রূপ ধারণ করেছে। যেই ভারত পাকিস্তানের সিন্ধু নদের ওপর কর্তৃত্ব করতে না পেরে পাকিস্তান কে তাদের ন্যায্য পাওনা দিয়ে দিতে বাধ্য হলো। চীনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে লাভ হলো না; বরং সেখানেও ব্যর্থ হলো। পরে বাংলাদেশের ওপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য পানি আগ্রাসনের নোংরা রাজনীতির চর্চা শুরু করল। যেহেতু ভারতের হিমালয় বাংলাদেশের নদীর উৎসস্থল। তাই তারা এমনভাবে ইচ্ছামত রাজনৈতিক কূটনৈতিক অপকৌশল চালাতে উদ্যত হয়। ভারতের এই একমুখী পানি নীতির বীভৎস কূটনৈতিক অপকৌশল, ষড়যন্ত্র এবং ভবিষ্যতে বড় ধরনের বিপর্যয় রোধ করার মানসে ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, দেশপ্রেমিক এবং সকল প্রকার অন্যায় অবিচারের মূর্ত আর্তনাদ মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন। পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের লক্ষ্যে তিনি ভারত সরকার কে আহ্বান জানান কিন্তু ভারত সরকার বিভিন্ন ধরনের টালবাহানা করে। কথা দিয়ে কথা না রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের অপচেষ্টা, কৌশল অবলম্বন করে। তৎকালীন ভারত সরকার ইন্দিরা গান্ধী ভাসানীর কার্যকরী আহ্বানে সাড়া না দেয়া এবং বাংলাদেশের পানির ন্যায্য হিস্যা না পাওয়ার দরুন গণ আন্দোলনের আহ্বান করেন। অথচ মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সেই সময়ে বয়স হয়েছিল ৯০ এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। তথাপিও তিনি দেশপ্রেমের জায়গা থেকে কোনো কিছু কে পরোয়া না করে পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের জন্য যে হুংকার দিয়েছিলেন তা এখনও অতীত ইতিহাস কে স্মরণীয় করে রাখে এবং বাংলাদেশের মুসলিমদের ঈমানী শক্তিকে শাণিত করে। পানির ন্যায্য হিস্যা বাংলাদেশের বৈধ অধিকার। অথচ সেই ন্যায্য হিস্যা আদায়ের ক্ষেত্রে ভারত সরকারের এমন ছলচাতুরি কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। এজন্য মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী লং মার্চের ঘোষণা দেন। ঘোষণা মাত্রই রাস্তায় নেমে আসে বিশাল জনতার সমুদ্র। সর্বস্তরের মানুষের রাজপথে নেমে আসার ঘটনা। রাজশাহীতে গিয়ে একত্রিত হয় জনসমুদ্র। আর সকলের স্লোগান ছিল "ফারাক্কার বাঁধ ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও, পানির ন্যায্য হিস্যা দিতে হবে"। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর দেশপ্রেম ও বাংলাদেশীদের এমন ন্যায্যতার আদায়ের অধিকারের দৃশ্য দেখে ভারত সরকার রীতিমত ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যায়। মাওলানা সাহেবের হুংকার ছিল ভারতের টনক নড়ানোর মত। ফলে ভারত সরকার তোপের মুখে পড়ে বাংলাদেশের পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করে। ইতিহাস বলছে– সেই জনসমুদ্রে মানুষের রাজপথে নেমে আসার সময় যার কাছে যা ছিল তাই নিয়ে মাঠে নেমেছিল। দা, বঁটি, ছুরি, কোদাল, শাবল ইত্যাদি জিনিসপত্র নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে নিজেদের ন্যায্য হিস্যা আদায়ের লক্ষ্যে এভাবেই রাজপথে নেমেছিল। বাংলাদেশিদের পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের জন্য বাংলাদেশের সকল স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে ভারতের লেজুড়বৃত্তি, তেল বাজি আর তাদের ওপর নির্ভর না করে; বরং ন্যায্য অধিকার সুনিশ্চিতের লক্ষ্যে সবাই কে ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম তৈরি করতে হবে। ভারতের সাথে যে সকল নদী নীতির শর্ত, চুক্তি রয়েছে যেগুলোর ক্ষেত্রে শক্ত অবস্থানে তার ন্যায্য হিস্যা আদায়ে সুনিশ্চিত ভূমিকা পালন করার প্রতি মনোযোগ রাখতে হবে এবং যে সকল নদীর ক্ষেত্রে অবাধ স্বৈরাচারিতা করছে সে বিষয়ে জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে করে এমন দুঃসাহস দেখাতে না পারে। আন্তর্জাতিক আইনের নদী নীতির বিষয় সামনে রেখে জন সচেতনতা এবং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত আমাদের ভারতের একতরফা পানি আগ্রাসনের অবৈধ নোংরা রাজনীতি সুষ্ঠু সমাধানে ভারতের বেঈমানি, ধৃষ্টতা কে আন্তর্জাতিক মহলে এমন ন্যক্কারজনক কাজের সততা ভিত্তিক কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখা এবং ভূ-রাজনৈতিক বিষয়কে পরিষ্কার রাখার স্পষ্ট ইতিবাচক অবস্থান জানানোর জন্য দাবি পেশ করতে হবে। সেইসাথে আমাদের দেশের ছোট, বড় নদী এবং বিভিন্ন জায়গায় শাখাগত প্রণালীগুলোকে পানি চলাচলের সহজ ব্যবস্থা করতে হবে। কোনো নদী যেন ময়লা আবর্জনা দিয়ে ভর্তি করা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। নচেৎ পানির অবাধ চলাচল ব্যবস্থা ব্যাহত হলে দেশের নদী সম্পদ, কৃষি সম্পদ ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হবে এবং ভারতের পানি আগ্রাসন করলে পানি সহজ চলাচলের পথ ও পন্থা না থাকার দরুন সীমাহীন ক্ষতির দিকে ঝুঁকে পড়বে। ভারত কোনোকালেই বাংলাদেশের বন্ধু ছিল না এবং ভবিষ্যতেও বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে ভূমিকা পালন করবে না। কারণ ভারত সবচেয়ে স্বার্থান্বেষী হিংসাত্মক রাষ্ট্র। এই উর্বর রাষ্ট্র কে গিলে ফেলার জন্য তারা উঠেপড়ে আছে। তারা পানি আগ্রাসনে পদ্মা খেয়েছে, যমুনা খেয়েছে। এভাবে সকল নদীর ওপর একক কর্তৃত্ব করার হীন অপচেষ্টা করে যাচ্ছে। তাই আমাদের উচিত ভারত হোক বা যে কোনো রাষ্ট্র হোক আমাদের স্বনির্ভরশীল থাকার জন্য সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালানো এবং আমাদের ন্যায্য হিস্যা আদায়ের জন্য গণ স্বোচ্চার হওয়া। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সেই শক্তি, সামর্থ্য দান করুন –আমীন। ❑

[১০৫] *বাংলাদেশ ভারত অভিন্ন নদীর পানি সংকট- আব্দুস সাত্তার, পৃ. ১৬।*

বিশেষ প্রতিবেদন

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার; আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা

–আব্দুল মোমেন

'৭১-এ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ"। স্বাধীনতার ৫২ বছর অতিবাহিত হলেও এখন পর্যন্ত প্রত্যাশা অনুযায়ী স্বাধীনতরা সুফল মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়নি। স্বাধীনতা যে কি, জনগণ তা বুঝে ওঠতে পারেনি। উপলব্ধি করতে পারেনি স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ। সাম্য ও সুশাসনের পরিবর্তে বৈষম্য ও দুঃশাসন, দুর্নীতি, নির্যাতন-নিপীড়ন, গুম-খুন ও বিচারবহির্ভূত হত্যা মানুষকে দিশেহারা করে তুলেছে। বিচারবিভাগই যখন অপরাধীদের হুকুমের তা'মিল করে তখন মানুষ কি আর সেখানে বিচার পায়? আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী যখন উপরের নির্দেশে বেআইনী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে মানুষ তো থাকে তখন নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকিতে। ক্ষমতাসীন দল যখন রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে নিজেদের ইচ্ছে মত তাদের তল্পিবাহক অযোগ্য লোকদেরকে বিভিন্ন কোটার মাধ্যমে নিয়োগ দিয়ে জাতির মেধাকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গও তখন ক্ষমতার দাপটে সীমাহীন অন্যায়-অনাচার, দুর্নীতি-লুটপাট ও স্বজনপ্রীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বহুমুখী অপরাধে জড়িয়ে পড়বে এটাই স্বাভাবিক। স্বভাবতই তারা তখন নিজেদের অপকর্মকে আড়াল করার জন্য ন্যায়-অন্যায় ভুলে গিয়ে চাটুকারিতার আশ্রয় নেয়। তারা কেউই তখন ক্ষমতাসীনদের ভুল-ত্রুটি দেখতে পায় না, হাজারো ভুলের পরেও নির্লজ্জের মত তারা ওদেরকেই সমর্থন করে। তারা ভুলে যায়, একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে যে দেশটি স্বাধীন হয়েছে, সে দেশের জনগণ যে কতটা বীর-বাহাদুর! যে কোনো মুহূর্তে তারা যে অস্ত্র ধরতে জানে, চ্যালেঞ্জ করতে পারে স্বয়ং সরকারকেও এমনটি প্রত্যক্ষ করেছেন। তা-ই তো গত ৫ আগস্ট'২৪ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ, ছাত্র-জনতার সাথে মিলে-মিশে একাকার হয়ে এক গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে দীর্ঘ সাড়ে ১৫ বছর যাবৎ জাতির ঘাড়ে চেপে বসা এক ভয়ানক ক্ষমতাধর স্বৈরশাসকের অবসান ঘটিয়েছে। জাতি ফিরে পেয়েছে তাদের সেই পুরানো স্বাধীনতা। ১৬ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত সে সময়কার সরকার ও সরকার প্রধান শেখ হাসিনা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে গুরুত্ব না দিয়ে চিরাচরিত সে কৌশল ব্যবহার করে তাদেরকে বিভিন্ন রকমের ট্যাগ দিতে থাকে, দমনপীড়নের নীতি গ্রহণ করে তা চালিয়ে যেতে থাকে, পুলিশ আন্দোলনকারীদের ওপর নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিজেবি ও ছাত্রলীগ মিলে নিরিহ ছাত্র-ছাত্রীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ফলে আন্দোলন তখন বাধভাঙ্গা স্রোতের রূপ ধারণ করে। রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী আবু সাঈদকে পুলিশ যখন গুলি করে, তখন সে একেবারে নিরস্ত্র ছিল। হাতে একটি লাঠি নিয়ে হাত দু'টি মেলে ধরেছিল। পুলিশ ইচ্ছে করলে তাকে গ্রেফতার করতে পারত, কিন্তু পুলিশ তা না করে স্বৈরশাসকের সমীহ পাওয়ার আশায় তার বুকে পরপর দু'টি গুলি করে তাকে হত্যা করে। কী নির্মম ছিল সে দৃশ্য! একবার কল্পনা করুন তো! শাসকগোষ্ঠীর সশস্ত্রবাহিনীর ভয়ংকর সব অস্ত্রের সামনে বৈষম্যের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে মৃত্যু জেনেও যে যুবকেরা বুক পেতে দিয়েছে তাদেরকে কী 'রাজাকার' বলা যায়? কিন্তু তাদেরকে তো তাই বলা হয়েছিল। এমন ট্যাগই তো দিয়েছিল। অথচ এরাই হলো এ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। এই একই দিনে নির্মমভাবে গুলি করে ছয় জনকে হত্যা করা হয়। আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলে সরকার প্রধান তখন আন্দোলনকারীদের সাথে আলোচনায় বসতে চায়। শিক্ষার্থীরা তখন আলোচনায় বসার সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করে সরকার পতনের একদফা দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। এই একদফা দাবির আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের সাথে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী ও গণমানুষ যুক্ত হয়। ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলনের মুখে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা পদত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় তার ছোটবোন রেহানাকে নিয়ে হেলিকপ্টারে চড়ে ভারতে পালিয়ে যায়। হাজারো মানুষের প্রাণের বিনিময়ে বিজয়ী হয়ে জাতি ফিরে পায় তাদের সেই গৌরবময় স্বাধীনতা। অনেকে আবার তাদের এ স্বাধীনতাকে দ্বিতীয় স্বাধীনতা বলে আখ্যা দিয়েছেন। এহেন পরিস্থিতিতে ছাত্র-জনতার অনুরোধে বিশ্ববরেণ্য নবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মোহাম্মদ ইউনূস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ৮ আগস্ট শপথ গ্রহণ করেন। দেশের এ ক্রান্তিলগ্নে যিনি ও যারা এদেশের হাল ধরেছেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও সরকারের যিনি প্রধান হয়েছেন তাদের সকলের কাছে এ জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা অনেক!

২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারীতে বিডিয়ার সদর দপ্তর "পিলখানায়" যে হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে তাতে

৫৭জন চৌকস সেনাকর্মকর্তাসহ অনেকে নিহত হয়েছেন। ২০১৩ সালের ৫ ও ৬ মে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে তালেবে 'ইল্‌ম, আলেম-উলামা ও সাধারণ জনগণের ওপর যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে এবং ২০২৪-এর ১৬ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত যে গণহত্যা চলেছে তাসহ সকল প্রকারের হত্যা ও হত্যাযজ্ঞের নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে প্রকৃত দোষীদেরকে দ্রুত বিচারের আওতায় এনে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। যারা নিহত হয়েছে তাদের পরিবারকে নগদ অর্থসহ পরিবারের কোনো একজন উপযুক্ত ব্যক্তির কর্মের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। যারা আহত হয়েছে তাদের সু-চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে। যারা বৈষম্যহীন এ দেশমাতৃকার জন্য অন্ধত্ব ও পঙ্গুত্ববরণ করেছে তাদেরকে সে অন্ধত্বের ও পঙ্গুত্বের জন্য ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। যাদেরকে গুম করা হয়েছে তাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে এবং তাদের গুমের পেছনে যারা জড়িত তাদেরকেও বিচারের মুখোমুখি করতে হবে। যারা নির্যাতিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দলীয় বিবেচনায় যেন কোনো বিচারকার্য সম্পন্ন না হয় এবং কখনো কোনো রাজনৈতিক দল যেন বিচার বিভাগে হস্তক্ষেপ করতে না পারে, বিচার বিভাগকে ঐরকম স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দলীয় ও রাজনৈতিক বিবেচনা কিংবা কোটার কারণে কোথাও, কখনো, কেউ যেন বৈষম্যের শিকার না হয়, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সে দাবি সর্বত্র অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। এদেশের প্রত্যেক নাগরিকের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। ধর্মীয় কিংবা রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতার কারণে কাউকে হেয় প্রতিপন্ন ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তাকে তার অধিকার হতে বঞ্চিত করা যাবে না। স্বাধীন এই দেশে সকলের বাক-স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। সকল প্রকারের সিন্ডিকেট ভেঙ্গে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য-দ্রব্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনতে হবে। লুট-পাট, চাঁদাবাজি, ঘুষ-দুর্নীতি, নিয়োগ বাণিজ্য ও ব্যাংক লুট করে যারা শত শত বা হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছে তাদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করতে হবে। ঋণ খেলাফীদেরকেও বিচারের মুখোমুখি করতে হবে। তাদেরকে যদি রাজনৈতিক কিংবা অন্য কোনো বিবেচনায় ঋণ দিয়ে থাকে তাহলে ঋণদাতা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকেও আইনের আওতায় আনতে হবে। নামে বেনামে থাকা তাদের সকল সম্পত্তি ক্রোক করে ব্যাংকের দায় মেটাতে হবে। ঘুষ দেওয়া কিংবা নেওয়ার দুঃসাহস যেন কেউ না দেখাতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষাখাতের সকল প্রকারের দুর্নীতিকে নিশ্চিহ্ন করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। সরকারী কর্মকমিশন, পি টি আই ও NTRCA-এর প্রশ্নফাস, সনদ জালকরণ ও নিয়োগ বাণিজ্যসহ সকল প্রকারের দুর্নীতি দূর করে সেখানে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিদেশি ও অদক্ষ সকল কর্মী ছাটাই করে এবং নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করে দক্ষ জনবল নিয়োগ দিয়ে দেশের বেকারত্ব দূরীভূত করতে হবে। প্রবাসীদেরকে যথোপযুক্ত মূল্যায়ন করতে হবে। নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য লেভেল প্লেইং ফিল্ড নিশ্চিত করতে হবে। কোনো নির্বাচিত সরকার যেন অদূর ভবিষ্যতে কখনো আর স্বৈরচারীর পথে পা বাড়াতে না পারে সেজন্য সংবিধান সংশোধান করতঃ প্রয়োজনীয় সকল কাঠামো সংস্কার করে জাতীয় নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচিত সরকারের মেয়াদ শেষে নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ব্যবস্থার সাংবিধানিক রূপ দিতে হবে। কোথাও দলীয়করণ হলে তত্ত্বাধায়ক সরকার বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যেন তা উপড়ে ফেলতে পারে এবং তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি করতে পারে সে জন্য প্রয়োজনে নির্বাচনকালীন এ সরকারের মেয়াদ তিনমাস থেকে বাড়িয়ে তিনবছর পর্যন্ত করা যেতে পারে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌম অক্ষুণ্ন রাখতে বিগত সময়ের সকল বৈদেশিক ও দ্বিপক্ষিয় চুক্তি পুনঃবিবেচনা করতে হবে। চাটুকারি সাংবাদিকতার কবর রচনা করে সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচারের জন্য সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। সংবাদ প্রচার ও অবাধ তথ্য প্রবাহের প্রয়োজনে ডিজিটাল কালো আইন সংশোধন কিংবা বাতিল করতে হবে।

পরিশেষে বলতে চাই– আমাদের সকলেরই চাওয়া এমন একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, যেখানে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালন করা হবে। সকল প্রকারের বৈষম্য দূর করে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে। দল-মত নির্বিশেষে সকল নাগরিক স্বাধীনতার সুফল ভোগ করবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যদি আমাদের এই আশা আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা পূরণে সর্বশক্তি নিয়োগ করে দৃশ্যমান কার্য পরিচালনা করেন। তাহলে বাংলাদেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন, হেফাজতে ইসলাম, খিলাফতে মজলিস ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনসহ এদেশের সকল রাজনৈতিক দল, সকল প্রবাসী ও সাধারণ জনগণ মিলেমিশে এ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সাধ্যানুযায়ী সকলপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ❑

৬৫ বর্ষ ॥ ৪৭-৪৮ সংখ্যা ❖ ০৯ সেপ্টেম্বর- ২০২৪ ঈ. ❖ ০৫ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৬ হি.

মুসলিমদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান

সংকলনে: হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ূব বিন ইদু মিয়া*
সংকলন সহযোগিতায়: গিয়াসউদ্দীন বিন আব্দুশ শুকুর

ভূমিকা: বর্তমান বিশ্বে মুসলিমদের অধঃপতন ও দুর্গতি দেখে যুব সমাজ আজ হতাশ। একদিকে তারা ইসলামের সঠিক ইতিহাস জানা থেকে বঞ্চিত অন্যদিকে মুসলিম বিদ্বেষী অপপ্রচারের তারা চরমভাবে বিভ্রান্ত। তাই মুসলিমদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তুলে ধরে এ কথাই জানাতে হবে যে, আর হীনবল নয় বীরের মতো জেগে উঠতে ও হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার আন্দোলনে যুব সমাজকে শামিল হতে হবে, আর এ লক্ষ্যে কয়েকটি দিক ও বিষয় তুলে ধরা হলো।

আমরা সেই সে জাতি

বিশিষ্ট সাহিত্যিক, গ্রন্থ প্রণেতা, গবেষক, বক্তা ও 'আলিম মাওলানা আবূ তাহের বর্ধমানি সাহেব তার অমূল্য গ্রন্থ "অধঃপতনের অতল তলে" বইয়ে বলেন– যে জাতির অঙ্গুলি হেলনে প্রবল পরাক্রান্ত রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের রাজমুকুট খসে গেছে। যে জাতির জাগ্রত শক্তির সম্মুখে শত্রুর বিপুল সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় ইমারতগুলি ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে। যে জাতি প্রিয় নবীর তিরোধানের পর মাত্র একশ' বছরের মধ্যে এশিয়ার আরব, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, পারস্য, তুর্কিস্তান, কাবুল, কান্দাহার, সিন্ধু ও চীনের মঙ্গোলীয়া পর্যন্ত নিজেদের রাজ্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। যে জাতির বীরত্ব বলে হাঙ্গেরিয়ায়, অস্ট্রিয়ায় আর রাশিয়া ও পোল্যান্ডের অংশ বিশেষে আর ক্রীটস, সাইপ্রাস, রোড্স ও আয়োনিয়ান প্রভৃতি ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল।

যে জাতির মাঝে আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মতো ন্যায়পরায়ণ মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল, যে জাতির মাঝে হামযাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মতো, 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র, 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু), 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু), হাসান ও হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র, খালিদ ইবনু ওয়ালিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র, মূসার, ত্বারেকের ও মুহাম্মাদ ইবনু কাসিমের মতো বীর সন্তানদের অভ্যুদয় ঘটেছিল। যে জাতির মাঝে ইমাম আবূ হানীফাহ্, মালিকের, মুসলিমের মতো আবূ দাউদের, নাসায়ীর, বুখারীর মতো, শাফি'য়ীর, আহমাদ বিন হাম্বলের, তিরমিযীর মতো, ইবনু মাজার, দায়ালামীর, বাইহাক্বীর, খতিবের, দারাকুতনীর ও দারেমী (রাহিমাহুল্লাহ)'র মতো শত সহস্র ফকীহ ও হাদীস তত্ত্ব বিশারদের জন্ম হয়েছিল।

ইসলামের সোনালি যুগ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– "তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন, তাদেরকে অবশ্যই দুনিয়ার শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। (তবে শর্ত হলো) তারা আমার 'ইবাদত করবে এবং ('ইবাদতে) আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারা অবাধ্য (হিসেবে গণ্য হবে)।"[১০৬]

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তিনটি ওয়াদা করেছেন– **১.** শেষ নবীর উম্মতকে দুনিয়ার খালিফাহ ও শাসনকর্তা করবেন; **২.** ইসলামকে শক্তিশালী করবেন ও **৩.** মুসলিমদেরকে এমন শক্তি ও শৌর্যবীর্য দান করবেন, তাদের অন্তরে শত্রুর কোনো ভয়ভীতি থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। ফলে মুসলিমরা সোনালি যুগ লাভ করেছিল। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'আমাকে সমগ্র ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত একত্র করে দেখানো হয়েছে। আমার উম্মাতের রাজত্ব যেসব এলাকা পর্যন্ত পৌঁছবে সেগুলো আমাকে দেখানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এই প্রতিশ্রুতি 'উসমানী খিলাফাতের আমলেই পূর্ণ করে দেন। [ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ)] আল্লাহ তা'আলা যেন মুসলিমদের অতীত সোনালি যুগ ফিরিয়ে আনার তাওফীক্ব দান করেন –আমীন।

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগ: রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শাসনকাল ৬২২ থেকে ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত, সর্বমোট ১০ বছর তার আমলে মাক্কা, মদীনা, খায়বার, বাহরাইন, সমগ্র আরব উপত্যকা ও সমগ্র ইয়েমেন তার দখলে আসে। তিনি হিজরের অগ্নিপূজারী ও সিরিয়ার কিছু অঞ্চল থেকে জিযইয়া করো আদায় করতেন। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস, মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট মুকাউকিস, আম্মান ও আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশি তার কাছে উপঢৌকন পাঠাতেন।

---

* সভাপতি, আহলে হাদীস লাইব্রেরি ঢাকা।

[১০৬] সূরাহ্ আন্ নূর: ৫৫।

খালীফাহ আবূ বক্‌র সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র যুগঃ মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওফাতের পর খালীফাহ আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খালিফাহ হন তার যুগে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ভণ্ড নবীর আবির্ভাব, যাকাত অস্বীকার করা ইত্যাদি অনাচার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। তিনি কঠোর হস্তে এসব অনাচার দমন করেন। তাছাড়া তিনি সিরিয়া ও মিসর অভিমুখে সৈন্যাভিযান পরিচালনা করেন। বসরা ও দামেস্ক তিনিই জয় করেন। অন্যান্য দেশের কিছু অঞ্চলও তার করতলগত হয়। তার আমল ছিল ৬৩২ থেকে ৬৩৪ ঈসায়ী পর্যন্ত দুই বছর।

'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র যুগঃ তার যুগ ছিল ৬৩৪ থেকে ৬৪৪ পর্যন্ত মোট ১০ বছর। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খালিফাহ হওয়ার পর শাসনব্যবস্থা ঢেলে সাজান। নবীদের আমল ছাড়া তার শাসনব্যবস্থার মতো এমন সুন্দর ও সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা দুনিয়াবাসী কখনো প্রত্যক্ষ করেনি। তার যুগে সিরিয়া সম্পূর্ণভাবে বিজিত হয়। তার শাসনামলে সমগ্র মিসর, জেরুজালেম ও পারস্যের অধিকাংশ দেশ মুসলিমদের করতলগত হয়। তার হাতে দুনিয়ার পরাশক্তি রোম ও পারস্য পরাশক্তি সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এমনকি অর্ধ দুনিয়া তার দখলে আসে।

'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র যুগঃ 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শাহাদাতের পর 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খালিফাহ হন। তার শাসনকাল ছিল ৬৪৪ থেকে ৬৫৬ ঈসায়ী পর্যন্ত মোট ১২ বছর। তার শাহাদাতের পর থেকেই মুসলিমদের মধ্যে দ্বিধাবিভক্তি সৃষ্টি হয়। ফলে মুসলিমদের থেকে রাজ্য চলে যাওয়া শুরু করে।

'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র যুগঃ 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র শাহাদাতের পর তিনি দেশ শাসনের ভার গ্রহণ করেন। ৬৫৬ থেকে ৬৬১ ঈসায়ী পর্যন্ত ছয় বছর তিনি দেশ শাসন করেন। তার শাসনকাল ছিল মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন সময়। মুসলিমদের মধ্যে সেই দ্বিধাবিভক্তি তাদেরকে দুর্বল করে দেয়। আর এ কারণে অনেক রাজ্য তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

বিশ্বজুড়ে মুসলিম শাসন

'উমাইয়াহ্ যুগঃ মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'উমাইয়া বংশ ৬৬১ থেকে ৭৫০ ঈসায়ী পর্যন্ত ৮৯ দেশ শাসন করেন। 'উমাইয়াদের মধ্যে অনেক শাসক এমন ছিলেন তারা অনেক নতুন দেশ দখল করেছিলেন। 'উমাইয়া শাসক ওয়ালিদের সময় হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মুহাম্মাদ ইবনু কাসিম ভারতবর্ষে অভিযান পরিচালনা করেন।

'আব্বাসী যুগঃ 'আব্বাসীয় শাসকরা ৭৫০ থেকে ১২৫৮ ঈসায়ী পর্যন্ত ৫০৮ বছর দেশ শাসন করেন। তাদের শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি সাধিত হয়। 'আব্বাসীয় যুগে ইরাক ও অন্যান্য এলাকায় মুসলিম শাসকরা প্রচুর শক্তি অর্জন করে।

'উসমানী যুগঃ 'উসমানী খিলাফাত বা অটোমান শাসন ১২৯৯ থেকে ১৯২৪ ঈসায়ী পর্যন্ত ৬২৫ বছর স্থায়ী ছিল। 'উসমানী আমলে ইসলামী বিজয়ের পরিধি দুনিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পাশ্চাত্য দেশসমূহ, আন্দালুস ও সাইপ্রাস পর্যন্ত দূর প্রাচ্যের চীন ভূখণ্ড পর্যন্ত এবং ইরাক, খোরাসান, আহওয়াজ ইত্যাদি মুসলিমদের দখলে ছিল।

স্পেনে মুসলিম শাসনঃ মুসলিম শাসকরা স্পেনে ৭১১ থেকে ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৭৮১ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করে। স্পেনে ইসলামী শাসন কায়েম করেন 'উমাইয়া সম্রাট ওয়ালিদ ইবনু 'আব্দুল মালিকের অধীনস্থ আফ্রিকার বাদশাহ মূসা ইবনু নুসাইরের বীর সেনানায়ক ত্বারিক ইবনু জিয়াদ।

ভারতবর্ষঃ ভারতবর্ষে মুসলিমরা শাসনকার্য পরিচালনা করেন ১২০৬ থেকে ১৮৫৮ ঈসায়ী পর্যন্ত ৬৫২ বছর। মুসলিম শাসকরা অমুসলিমদের মুসলিমদের চেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন। কোথাও একটি মাসজিদ প্রতিষ্ঠা করলে, অন্য ধর্মাবলম্বীদের জন্যও একটি উপাসনালয় করেছেন। ভারতবর্ষের তাজমহল দেওয়ানি আম, দেওয়ানি খাস, শীষমহল, কুতুব মিনার ইত্যাদি মুসলিমদের অবদান।

অমুসলিমদের চক্রান্ত ও তার জবাব

৭৫০ থেকে ১২৫৮ সাল পর্যন্ত ইসলামের স্বর্ণযুগ বা ইসলামিক রেনেসাঁ হিসেবে পরিচিত। এই সময় মুসলিম সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞান, আবিষ্কার, রাজনীতি, বাণিজ্য, ভূখণ্ড দর্শন সব দিক থেকে স্বর্ণশিখরে আরোহণ করে এবং সেই সময় এই মুসলিম সভ্যতার সাথে অন্য কোনো সভ্যতার তুলনাই ছিল না। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক জ্যাক লিখেছেন, 'ইসলাম তার ক্ষমতা, শিক্ষা ও শ্রেষ্ঠতর সভ্যতার জোরে বিশ্বে ৫০০ বছর আধিপত্য করেছে।'

কিন্তু ক্রুসেডারদের পরবর্তী বংশধর মুসলিমদের এই গৌরবোজ্জ্বল অর্জন ও ইতিহাস বিকৃত করার জন্য অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে নানা প্রচেষ্টা চালায়। তারা তাদের দুরভিসন্ধি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে এই সময়টিকে অর্থাৎ- মধ্যযুগকে অন্ধকার ও বর্বর যুগ হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছে। কিন্তু সত্য ইতিহাস কখনো মুছে ফেলা যায় না। হ্যাঁ, মধ্যযুগ অন্ধকারাছন্ন ও বর্বর ছিল তবে সেটি মুসলিম সভ্যতা নয়; বরং তখন গোটা ইউরোপই অন্ধকার ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। অবাক করা বিষয় হচ্ছে– পশ্চিমারা স্বর্ণযুগের মুসলিম বিজ্ঞানীদের নানান বই ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করতে গিয়ে

অত্যন্ত অদ্ভুত ও ঘৃণিত এক কাজ করে বসে। তারা ইতিহাসে প্রথমবারের মতো অনুবাদের পাশাপাশি মুসলিম বিজ্ঞানীদের নাম পর্যন্ত পরিবর্তন করে ফেলে, যেটিকে তারা বলে ল্যাটিন ভাষায় নাম অনুবাদ। আচ্ছা নাম কি কখনো অনুবাদ করা যায়! বা নাম কি অনুবাদ করার মতো কোনো জিনিস? তারা মুসলিম বিজ্ঞানীদের এমন এমন নাম দেয়, যা শুনে বোঝার উপায় নেই যে, তারা আসলে মুসলিম।

মুসলিম লেখক ও বিজ্ঞানীদের নাম বেশ বড়সড় হলেও, ল্যাটিন ভাষায় তাদের নাম দেয়া হয়েছে একটি মাত্র শব্দে। যেমন- ইবনু সিনার পুরো নাম আবূ 'আলী আল-হুসাইন ইবনু 'আব্দুল্লাহ ইবনে সিনা হলেও পরিবর্তন করে তার নাম দেয়া হয়েছে আভিসিনা (Avicenna), বীজগণিতের জনক আল খাওয়ারিজমির নাম দেয়া হয়েছে এলগোরিজম (Algorism), প্রথম মানচিত্র অঙ্কনকারী আল-ইদ্রিসের নাম দেয়া হয়েছে দ্রেসেস (Dresses)। শুধু এই কয়েকজনের নাম নয়; বরং সব মুসলিম বিজ্ঞানীর প্রতিই তারা এই অবিচার করেছে। তাদের দেয়া এই নামগুলো যখন কোনো শিক্ষার্থী বা যে কেউ প্রথমবার শুনবে, তারা কখনো চিন্তাও করবে না যে, তারা আসলে মুসলিম। নাম শুনে তাদেরকে অমুসলিম হিসেবে ভেবে নেবে। মানে ব্যাপারটি একবার ভেবে দেখেছেন, কত গভীর আর সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত। ইসলামিক স্বর্ণযুগের শুরুতেও তো মুসলিমরা প্রাচীন গ্রিক ও ভারত দার্শনিকদের নানা রচনা আরবি, সিরীয় ইত্যাদি ভাষায় অনুবাদ করেছে। কই তারা তো এমনটি করেনি। এই পুরো ব্যাপারটি আমাদের কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত ঠেকেছে। লেখকের আসল নাম বদল করে নতুন নাম দেয়ার মতো এমন ঘটনা এর আগে বা পরে কখনো ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। তারা শুধু নাম বিকৃত করা পর্যন্তই থেমে থাকেনি, এমনকি তাদের পরিচয় নিয়েও নানা বিভ্রান্তি ও ধূম্রজাল সৃষ্টি করেছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান

আমরা কি জানি দুনিয়ার প্রথম নির্ভুল মানচিত্র অঙ্কনকারী ও বিশ্বের প্রথম স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের আবিষ্কারক কে ছিলেন? কিংবা গুটিবসন্তের আবিষ্কারক, স্ট্যাটিস্টিকের প্রতিষ্ঠাতা, আলোক বিজ্ঞান, রসায়ন, বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতির জনক কে? কে-ই বা মিল্কিওয়ের গঠন শনাক্ত করেছিলেন? পদার্থ বিজ্ঞানে শূন্যের অবস্থান কে শনাক্ত করেছিলেন? ফাউন্টেন পেন, উইন্ডমিল, ঘূর্ণায়মান হাতল, পিন হোল ক্যামেরা, প্যারাসুট, শ্যাম্পু ইত্যাদি জিনিস বা বস্তু কারা আবিষ্কার করেছিলেন? এই প্রতিটি জিনিস বা বস্তুর আবিষ্কারক, গবেষক, উদ্ভাবক ছিলেন মুসলিম বিজ্ঞানীরা। যা আমরা খুব কম মানুষই জানি। বর্তমানে যে মুসলিমরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, আবিষ্কার ইত্যাদি দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়েছে তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এ নিয়ে অনেক মুসলিম শিশু, কিশোর বা সাধারণ মুসলিমরাই হীনম্মন্যতায় ভোগে। তারা দেখে সব বিজ্ঞানীরাই ইহুদি, খ্রিষ্টান বা অমুসলিম। তাদের মনে প্রশ্ন জাগে– কেন মুসলমানদের মধ্যে কোনো বিজ্ঞানী নেই? এ পরিস্থিতির জন্য অনেকগুলো কারণই দায়ী- মুসলিম বিজ্ঞানী নেই! মুসলিমদের উদ্ভাবনী মেধা নেই! মানবসভ্যতার সব বড় বড় আবিষ্কার করেছেন অমুসলিম বিজ্ঞানীরা– এই তত্ত্ব কে আমাদের দিয়েছে? বিজ্ঞানী হিসেবে গ্যালিলিও, আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল, লুই পাস্তুর, আলফ্রেড নোবেলদের কথা জানলেও জাবির ইবনু হাইয়ান, আল কিন্দি, আল খাওয়ারিজমি, আল ফরগানি, আল রাজী, ইবনু সিনা, আল ফারাবি, 'উমার খৈয়ামদের কথা আমরা কয়জনই বা জানি? কেন এমনটা হলো? এর কয়েকটি কারণ হলো– **১.** ক্রুসেডারদের (খ্রিষ্টানদের) সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ইসলামী স্বর্ণযুগ আড়াল করা বা মুসলিম বিজ্ঞানীদের পরিচয় লুকানো এবং তাদের পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা। **২.** মুসলিমদের সরলতার সুযোগ নিয়ে অমুসলিমদের চাপিয়ে দেয়া শিক্ষাব্যবস্থার বিকৃত তত্ত্বগুলো মেনে নেয়া; মুসলিমদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, মুসলিম বিজ্ঞানী ও তাদের আবিষ্কারগুলো কৌশলে পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দেয়া। **৩.** বর্তমানে আমাদের এ বিষয়গুলো জানার ইচ্ছা না করা।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবদান অন্যান্য ধর্ম ও জাতির তুলনায় অনেক অনেক বেশি। ইসলামের সূচনা থেকেই শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে মুসলিমদের যাত্রা শুরু হয়। মুসলিম দার্শনিকদের সৃষ্টিশীল প্রতিভার ফলেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অভাবনীয় সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সব শাখায় মুসলিমদের অবদান রয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকে ইসলাম যেহেতু মর্যাদা দান করে উৎসাহিত করেছে; ফলে যুগে যুগে অনেক মুসলিম মনীষী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। মানবিক জীবনের যাবতীয় সমাধান মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে রয়েছে। কুরআনকে পর্যবেক্ষণ করে মানবতার কল্যাণে মুসলিম বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন বিষয় আবিষ্কার করেছেন। চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, গণিত, ভূগোল প্রভৃতিসহ আরো বিভিন্ন বিষয়ে মুসলিম মনীষীদের ব্যাপক অবদান লক্ষণীয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলমানদের অবিস্মরণীয় অবদান সংক্ষেপে কিছু তথ্য তুলে ধরলাম–

১. আল কিন্দিঃ সুবিখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত 'আল্‌কিন্দি' দর্শন শাস্ত্রের গোড়াপত্তন করেছিলেন। তিনি দর্শন, চিকিৎসা, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, রাজনীতি ও ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে দু'শো পঁয়ষট্টিখানা অতি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এবং বারো শতকের টমাস আকুইনাস পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপের ওপর একাধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

২. মুহাম্মাদ ইবনু জাকারিয়াঃ মুহাম্মাদ ইবনু জাকারিয়া একজন শ্রেষ্ঠ রসায়ন শাস্ত্র বিশারদ ছিলেন। তিনি হীরাকষকে শোধন করে গন্ধব দ্রাবক তুঁতিয়া প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি কৃত্রিম উপায়ে বরফ তৈরি করে সকলকে অবাক করে দিয়েছিলেন। তিনি 'আলকেমী বিষয়ে কিতাবুল আস্‌রার নামে অতি মূল্যবান একখানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। মিষ্টার জিরার্ড সাহেব ল্যাটিন ভাষায় এই মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন এবং তা রসায়ন শাস্ত্রের প্রমাণ্য গ্রন্থ হিসাবে সারা ইউরোপের পাঠ্যপুস্তক ছিল। তিনি দু'শো খানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সর্বপ্রথম পৃথিবীর মানচিত্র তিনিই এঁকেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম ডিগ্রীর মাপে পৃথিবীর ব্যাস ও পরিধি নিরূপণ করেছিলেন।

৩. মূসা আল খারেজমীঃ ইউরোপের গবেষণাকারীরা মূসা আল খারেজমীর এই গবেষণাকেই তাদের গবেষণার মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, বীজগণিতের জন্মদাতা, ছিলেন তিনিই। তাঁর আল জবর নামক বীজগণিতের মৌলিক গ্রন্থ থেকে ইউরোপীয় 'এলজেবরা' শব্দটি চয়ন করা হয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে মিষ্টার জিরার্ড ল্যাটিন ভাষায় এই 'আল জবর' গ্রন্থখানির অনুবাদ প্রকাশ করেন। বলাবাহুল্য, এই অনুবাদখানা ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বীজগণিতের প্রধান ও প্রামাণ্য গ্রন্থে হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। তিনি একখানা বিরাট বীজগণিত প্রণয়ন করেছিলেন আর তাতে তিনি সর্বপ্রথম সংখ্যা বাচক চিহ্নগুলি ব্যবহার করে দেখিয়েছিলেন। তাছাড়া আল বাত্তানী, আল ফারগানী, আল বিরুনী, 'উমার খৈয়াম ও নাসিরুদ্দীন তুসীর মতো মুসলিম মনীষীগণ জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে গেছেন।

৪. ইবনু খালদুনঃ ইবনু খালদুন সমাজতত্ত্বের মূল সূত্র আবিষ্কার করে, ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহকে বিচার করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করে ইতিহাস দর্শনের সৃষ্টি করে গেছেন। ভূগোলে, খগোলে, অর্থনীতিতে শিক্ষা বিজ্ঞানেও তাঁর আশ্চর্য দখল ছিল। কেবলমাত্র ইবনু খালদুনই নন বলাজুগীর মতো, হামাদানীর মতো, আল বিরুনীর মতো, আত্ তাবারীর মতো, আল মাসুদীর মতো, ইবনু হগজমের মতো, ইবনুল আসীরের মতো, ইবনুল খল্লকানের মতো ও শাহ ওয়ালীউল্লাহর মতো শত শত বিশ্ব বিশ্রুত মুসলিম ঐতিহাসিকের অবদানে মানব ইতিহাস সমৃদ্ধ ও উন্নত হয়েছে।

৫. জাবির ইবনু হাইয়্যানঃ রসায়ন শাস্ত্রের জন্মদাতা হচ্ছে এই মুসলিম। ধাতু সম্পর্কে জাবির ইবনু হাইয়ানের মৌলিক মতামত আঠার শতক পর্যন্ত ইউরোপের রসায়ন শিক্ষায় বিনা দ্বিধায় গৃহীত হতো।

৬. জ্ঞান, গবেষণা ও সভ্যতায়ঃ জ্ঞান ও সভ্যতায় 'আব্বাসী খলীফাদের রাজধানী ছিল বাগদাদ। এককালে জগতের সবচেয়ে বৃহৎ ও উন্নত নগরী হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিল এই বাগদাদ। যেদিন আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া কথা ভুলেও মানুষ মুখে আনতো না, যেদিন ইউরোপ অশিক্ষা ও কুশিক্ষার অন্ধকারে ডুবেছিল, সেদিন ধর্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, স্থাপত্য, আইন, বিচারালয়, চিন্তা ও গবেষণা প্রভৃতি মানব জীবনের সকল প্রকার চাহিদা মিটাতে বাগদাদের অবদান ছিল অতুলনীয়। সে যুগে বাগদাদের নিজামিয়া ইউনিভারসিটি ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ইউনিভারসিটি। আর বাগদাদের লাইবেরীই ছিল জগতের তুলনাহীন লাইব্রেরী। লক্ষ লক্ষ জ্ঞানপিপাসু পঙ্গপালের মত ছুটে যেতো শিক্ষা লাভের আশায় এই বাগদাদের ইউনিভারসিটিতে। যখন বাগদাদ গৌরবের সুউচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত ছিল, তখন সুন্দরী ও চিত্তাকর্ষক সে নগরীকে মুসলিম খলীফাদের উপযুক্ত রাজধানী বলেই মনে হতো। যে জাতি কর্ডোভা, গ্রানাডা, সেভিল, নিজামিয়া, আল আজহার ও নাদওয়াতুল উলামার মতো বিশ্ব বিশ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল। ইতিহাস, ভূগোল, খগোল, গণিত, পশুবিদ্যা, চিকিৎসা, স্থাপত্যবিদ্যা, কলাবিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্রে যে জাতির হাজার হাজার পণ্ডিতের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে অলংকৃত করে রেখেছে। যে জাতির লাইব্রেরীগুলো পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ।

৭. চিকিৎসা-বিজ্ঞানেঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো চিকিৎসাবিজ্ঞান। শরীর সম্পর্কিত বিদ্যা হলো চিকিৎসাবিজ্ঞান। চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা ও উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসবিদ আল কিফতি তার 'তারিখুল হুকামাত'-এ লিখেছেন, 'ইদ্রিস (আলাইহিস সালাম) হলেন প্রথম চিকিৎসাবিজ্ঞানী। আর ইসলামের সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (ﷺ) ছিলেন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিজ্ঞানী। চিকিৎসাশাস্ত্রে কুরআনের অবদান উল্লেখ করতে গিয়ে জার্মান পণ্ডিত ড. কার্ল অপিতজি তার গ্রন্থে

দেখিয়েছেন, কুরআনের ১১৪টি সূরার মধ্যে ৯৭টি সূরার ৩৫৫টি আয়াত চিকিৎসাবিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট। তা ছাড়া হাদীসের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ সহীহুল বুখারীতে 'তিব্বুন নববী' শীর্ষক অধ্যায়ে ৮০টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। সেখানে রোগের চিকিৎসা-পদ্ধতি, রোগ নিরাময় ও রোগ প্রতিরোধ কার্যাবলি সংবলিত। এছাড়াও চিকিৎসাশাস্ত্রে বিভিন্ন মুসলিম মনীষী বিশেষ ভূমিকা রাখেন। তাদের মধ্যে ইবনু সিনা, আল-রাজী, আল-কিন্দি, 'আলী আত তাবারি, ইবনু রুশদ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চিকিৎসার ব্যাপারে সকলে মুসলিমদের কাছেই ঋণী। মুহাম্মাদ ইবনু জাকারিয়া একখানা বিরাট আভিধানিক গ্রন্থ লিখেছিলেন, যার নাম হলো 'আল হাবী।' এই গ্রন্থে সর্বপ্রকার রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাসহ চিকিৎসার প্রণালী ও ওষুধের ব্যবস্থা ছিল। বলাবাহুল্য, চিকিৎসা বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ অবদান হিসেবে এই কিতাবখানা ইউরোপীয় চিন্তারাজ্যে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। সিসিলির রাজা প্রথম চার্লস এই সুবৃহৎ গ্রন্থের প্রতি বিশেষ যত্ন নিয়েছিল এবং ষোল শতক পর্যন্ত সারা ইউরোপের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পুস্তকখানি বিশেষ পাঠ্য ছিল। মুসলিমদের কাছে অস্ত্রো চিকিৎসার ব্যাপারে সারা ইউরোপ ঋণী। শুধু ইউরোপই নয়, সারা জগৎকে আবুল কাসেম আল জাহবী তাঁর আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। তিনি কর্ডোভার বিখ্যাত হাসপাতালের শ্রেষ্ঠতম অস্ত্র চিকিৎসা বিশারদ ও প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর চিকিৎসা বিষয়ক বিরাট গ্রন্থ আত্তসরীফ বিশ্বের অমূল্য সম্পদ। তাঁর কাছে বিশ্বের দূরারোগ্য রোগীরা আরোগ্য লাভের আশায় ছুটে যেতো। খ্রিষ্টান, ইয়াহূদী, মিসরী, আরবী, আজমী ও মরক্কোবাসী শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভের আশায় তাঁর বাড়ীতে ভিড় জমাতো। শুধু জাবির ইবনু হাইয়ানই নন। আল ফারাবী, ইবনু সিনা, আল বিরুনী, আল গাজ্জালী, ইবনু বাজা ও ইবনু রুশদের মতো দর্শন, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ সাধনকারী মুসলিম মনীষীগণ পৃথিবীর অসামান্য প্রতিভা।

৮. ঔষধশাস্ত্রঃ মুসলিমরা চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে ঔষধশাস্ত্রে ব্যাপক অবদান রাখেন। তারা নিজেরা বিভিন্ন রোগের ওষুধ তৈরি করতেন। তাছাড়া ওষুধ তৈরি ও বিভিন্ন রোগের সমাধান প্রসঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন- ইবনু সিনার 'কানুন-ফিত-তিব্ব', আল রাজীর 'কিতাবুল মনসুরি', আলবেরুনির 'কিতাব আস সায়দালা' 'আলী আল মাওসুলির চক্ষু চিকিৎসার সবচেয়ে দুর্লভ ও মূল্যবান গ্রন্থ 'তাজকিরাতুল কাহহালিন' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

৯. অস্ত্রোপচারঃ মুসলিম বিজ্ঞানী আল-রাজী সর্বপ্রথম অস্ত্রোপচার বিষয়ে আধুনিক ভাবনা উদ্ভাবন করেন।

১০. চক্ষু চিকিৎসায়ঃ চক্ষু চিকিৎসায় মুসলিমদের মৌলিক আবিষ্কার রয়েছে। আলী আল মাওসুলি চোখের ছানি অপারেশনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। জর্জ সার্টনও তাকে জগতের সর্বপ্রথম মুসলিম চক্ষু চিকিৎসক বলে অকপটে স্বীকার করেছেন। তার 'তাজকিরাতুল কাহহালিন' চক্ষু চিকিৎসায় সবচেয়ে দুর্লভ ও মূল্যবান গ্রন্থ। এ ছাড়া চিকিৎসাশাস্ত্রে হাসান ইবনু হাইসাম, আলবেরুনি, আলী ইবনু রাব্বান, হুনাইন ইবনু ইসহাক, আবুল কাসেম জাহরাবি, জুহান্না বিন মাসওয়াই, সিনান ইবনু সাবিত, সাবিত ইবনু কুরা, জাবির ইবনু হাইয়ান প্রমুখও উল্লেখযোগ্য।

১১. হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাঃ রাসূল (ﷺ) তাঁর জীবদ্দশায় বিশেষত যুদ্ধকালীন সময়ে যে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন সে ধারণাকে কাজে লাগিয়ে পরবর্তীতে মুসলিম শাসকরা সঠিক চিকিৎসা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গবেষণা ও ব্যবহারিক জ্ঞানচর্চার স্বার্থে বিভিন্ন স্থানে স্থায়ী চিকিৎসাকেন্দ্র তথা হাসপাতাল গড়ে তোলেন। খালিফাহ ওয়ালিদ ইবনু মালিকের শাসনামলে প্রথম স্থায়ী হাসপাতাল তৈরি করা হয়। ধর্ম-বর্ণ ভেদে সবাই সেখানে চিকিৎসা পেত। রোগভেদে ছিল আলাদা ওয়ার্ড ব্যবস্থা। মুসলিম সালতানাতে প্রতিষ্ঠিত তৎকালীন হাসপাতালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– সিরিয়ার দামেস্ক শহরের আল-নুরি হাসপাতাল, জেরুসালেমের আল সালহানি, বাগদাদের আল-সাইয়িদাহ, আল-মুক্তির আদুদি হাসপাতাল, কায়রোর আল মানসুরি হাসপাতাল, আফ্রিকার মরক্কোর আল-মারওয়ান ও তিউনিসের মারাবেশ হাসপাতাল উল্লেখযোগ্য।

১২. রসায়নশাস্ত্রঃ বিজ্ঞানের সর্ববৃহৎ ও প্রধান শাখার নাম রসায়ন। রসায়নশাস্ত্রের জনক বলা হয় জাবির ইবনু হাইয়ানকে। রসায়নশাস্ত্রে বিভিন্ন মুসলিম মনীষী অবদান রাখেন। তাদের মধ্যে জাবির ইবনু হাইয়ান, খালিদ ইবনু-ইয়াজিদ, জাকারিয়া আল রাজী, আল-জিলদাকি প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

১৩. স্থাপত্য শিল্পেঃ আগ্রার তাজমহল, জেরুজালেমের 'উমারের মাসজিদ, কনস্টান্টিনোপল বা ইস্তাম্বুলের সেন্টসফিয়া মাসজিদ, কর্ডোভার মাসজিদ, স্পেনের আলহামরা, দিল্লীর দেওয়ানে আম. দেওয়ানে খাস, মতিমসজিদ, জামে মাসজিদ প্রভৃতি তৈরি করে মুসলিমরাই স্থাপত্য শিল্পে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। এদেশের প্রায় হাজার বছরের ইতিহাস মুসলিমরাই তৈরি করেছে।

১৪. যৌগিক সূত্র আবিষ্কারঃ জাবির ইবনু হাইয়ান প্রথম এসিড, গন্ধক, দ্রাবক, জল দ্রাবক, রৌপ্যক্ষার ও অন্যান্য

যৌগিক সূত্র আবিষ্কার করেন। তা ছাড়া তিনি ভস্মীকরণ ও লঘুকরণকে বৈজ্ঞানিক নিয়মে আলোচনা করেছেন।

১৫. ডিমের পানি প্রস্তুতকরণ: একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত রসায়নবিদ ইমাম জাফর আস-সাদিক সর্বপ্রথম রসায়নশাস্ত্রের আলোকে ডিমের পানি প্রস্তুতকরণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

১৬. ধাতুর পরিবর্তন: মুসলিম মনীষী আবুল কাশেম আল ইরাকি সর্বপ্রথম ধাতুর পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা দেন।

১৭. জ্যোতির্বিদ্যা: জ্যোতির্বিদ্যা হলো মহাকাশ-সম্পর্কিত বিজ্ঞান। গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য ও অলৌকিক বস্তুগুলোর গতিবিধি নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাকে জ্যোতির্বিজ্ঞান বলে। দুনিয়ার গতিবিধি, অক্ষাংশের পরিবর্তন, ধূমকেতুর রূপ নির্ণয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবদান ঈর্ষণীয়। জ্যোর্তিবিদ্যার উৎকর্ষ সাধনে যে ক'জন অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে আল মনসুর, আল মামুন, আবূ মাশার, আল খারেজমি, আবুল হাসান প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

১৮. বর্ষপঞ্জি ও নক্ষত্র: 'উমার খৈয়াম প্রথম বর্ষপঞ্জি প্রণয়ন করেন। পরবর্তীতে আল-বাত্তানি সর্বপ্রথম নক্ষত্রের চার্ট তৈরি করেন।

১৯. উদ্ভিদবিদ্যা: উদ্ভিদবিদ্যায় মুসলিমদের অবদান অপরিসীম। উদ্ভিদবিদদের মধ্যে ইবনু বাতরের নাম উল্লেখযোগ্য। লতাপাতা সম্পর্কিত তার তথ্যবহুল গ্রন্থটি আজো সবার কাছে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তাছাড়া মুসলিমরা ভূতত্ত্ব ও প্রাণিতত্ত্বের উন্নতি সাধন করেছিলেন।

২০. পদার্থবিদ্যা: জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো মুসলিমরা পদার্থবিদ্যায় ব্যাপক অবদান রেখেছেন। পদার্থবিজ্ঞানে যেসব মনীষী অসামান্য অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে ইবনু রুশদ, আলবেরুনি, আল-খারিজমি, ইবনুল হাইসাম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। পর্দাথবিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে- তামহিদুল মুসতাকাররে লিমানিল মামারবে, কিতাবুল মানায়িব, রিসালাতু ফিশাশফক প্রভৃতি।

২১. গণিতশাস্ত্র: গণিতশাস্ত্রের প্রচলন, অগ্রগতি ও উৎকর্ষতায় মুসলমানদের অবদান অনস্বীকার্য। যারা গণিতশাস্ত্রকে উন্নতির আসনে বসিয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন- আলবেরুনি, আল-খারেজমি, আল-কারখি, 'উমার খৈয়াম ও আবুল ওয়াদা প্রমুখ।

২২. সংখ্যাবাচক চিহ্ন: মুসলিম গণিতবিদ আল খারিজমি সর্বপ্রথম সংখ্যাবাচক চিহ্নের ব্যবহার বিষয়ে ধারণা দেন। গণিতশাস্ত্রের ওপর তার বিখ্যাত গ্রন্থ হলো কিতাবুল হিন্দ। এখানে তিনি গণিতের বিভিন্ন জটিল বিষয়ের সমাধান দেখিয়েছেন।

২৩. দূরত্ব নির্ণয়: বিজ্ঞান ও গণিত জগতের এক অনন্য নাম ইবনুল হাইশাম। তিনিই প্রথম জ্যামিতিক গণনার সাহায্যে দুনিয়ার যেকোনো দু'টি স্থানের মধ্যে দূরত্ব নির্ণয় করেন।

২৪. মানচিত্রের ধারণা: বিশ্ব মানচিত্রের প্রথম ধারণা দেন মুসলিম মনীষী আল-ইদ্রিসি। পরবর্তীতে এটিই বিশ্ব মানচিত্রের মডেল হিসেবে স্বীকৃত হয়।

২৫. সমুদ্র, সূর্য ও নক্ষত্র: মুসলিম বিজ্ঞানী আল-ফারাবি সর্বপ্রথম সমুদ্রে সূর্য ও নক্ষত্রগুলোর উচ্চতা নির্ণয় করার আস্তারলব নির্মাণ করেন।

নিউ জেনারেশনের করণীয়

এবার আমাদের অবস্থা নিয়ে কিছু কথা বলা যাক। আমরা কি মুসলিম বিজ্ঞানী ও তাদের আবিষ্কার ও গবেষণাগুলো সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছি? তাদের নিয়ে আলোচনা কিংবা লেখালেখি করছি? আমাদের শিশু-কিশোররা কি গ্যালিলিও, নিউটনদের পাশাপাশি নাসিরুদ্দিন তুসি, আল-ফরগানি, আল-ফারাবিদের সম্পর্কে কখনো জেনেছে, তাদের সম্পর্কে কখনো পড়েছে? বিজ্ঞান-বিষয়ক শিশুতোষ বা কিশোর লেখাগুলোতে তারা কি কখনো মুসলিম বিজ্ঞানীদের অসাধারণ গবেষণা, আবিষ্কারগুলো সম্পর্কে জেনেছে? কেন এমনটি হলো? আসলে এ বিষয়ে পশ্চিমারা যে নীতি বা শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে, আমাদের পরাজিত মন-মানসিকতাও তা বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছে।

আমরা কি পারি না ইসলামের স্বর্ণযুগের ইতিহাস নিয়ে চর্চা করতে, মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান ও আবিষ্কার নিয়ে কথা বলতে? আমাদের শিশু-কিশোররা যখন তাদের পূর্বপুরুষদের এই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও অর্জনগুলো সম্পর্কে জানবে, তখন তাদের মধ্যে আর হীনম্মন্যতা কাজ করবে না। এই ইতিহাস তাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে দারুণভাবে। হলিউড, বলিউডের নায়ক-নায়িকা, গায়ক বা সেলিব্রেটি খেলোয়াড় কিংবা তথাকথিত টিকটক সেলিব্রেটিদের বদলে খুঁজে পাবে তার আসল আদর্শকে। তখন আবূ বক্‌র, 'উমার, 'আলী, 'উসমান, খালিদ ইবনু ওয়ালিদ, মুহাম্মাদ ইবনু কাসিম, ত্বরিক ইবনু যিয়াদ, ইবনু সিনা, সাবেত ইবনু কোরা, 'উমার খৈয়ামরা হবেন তাদের আইডল।

তথ্যসূত্র: ***১.*** *অধঃপতনের অতলতলে- মাওলানা আবূ তাহের বর্ধমানী।* ***২.*** *মুফতি মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম (দৈনিক নয়া দিগন্ত- ১০ জুন'২১)।* ***৩.*** *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান- মুহাম্মদ নুরুল আমীন।* ***৪.*** *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার- সাহাদত হোসেন খান।* ***৫.*** *Biographies of Muslim Scholars and Scientists।* ***৬.*** *গুগল উইকিপিডিয়া- দৈনিক ইসলামী দিগন্ত, ৩ জানুয়ারী'২৩ ঈ.।*

কবিতা

গাই তোমারি গান

মোল্লা মাজেদ★

স্বপ্ন তীরে কথার ভিড়ে জাগলো আমার প্রাণ
কাব্যিকতার গাঁথন গেঁথে গাই তোমারি গান।
নিবিড়ঘন তিমির রাতে
তোমায় ডাকি জোড় দু'হাতে
ক্ষমার দুয়ার দাও খুলে দাও রহিম রহমান
সকল ভুলে হৃদয় খুলে গাই তোমারি গান
নিত্য আমার চিত্ত দোলে কল্লোলোকের তীরে
হতাশা আর ঘোর নিরাশা সর্বজীবন ঘিরে।
ক্ষণিকের এ জীবন রথে
চলতে পারি সঠিক পথে
সেই সুমতি দাও দয়াময় আলোয় ভাসাও প্রাণ
জীবনে মরণে তোমারি স্মরণে গাইতে পারি গান।
তোমার নূরের রওশনিতে দাও ভরে এই দিল্
তার ঝলকেই থাকবে দূরে ইবলিস আজাজিল।
পুণ্যে ভরাও হৃদয়খানি
শূন্যে মিলাও সকল গ্লানি
পাপ পুণ্যের শেষ বিচারে জান্নাত করো দান
জীবন ভরে তোমার তরে গাইবো তোমার গান।

কথা কিন্তু হাছা

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক★

আমি কিছু বলবো কথা
দেশবাসী, ভাই, চাচা-
শুনতে একটু মন্দ হলেও
কথা কিন্তু হাছা।
পরের টাকা লুটে খেয়ে
মোটা করছে পাছা-
তেলের খনি নেতার ঘরে
তুললে খাটের মাচা!
দাবি করে আল্লার ওলি
দাড়ি কিন্তু চাঁছা-
কথা দিয়ে চিড়া ভেজায়
সবখানে পরগাছা!
মানুষেরও হইছে নকল
নেই তো কিছু সাঁচা!
ভালো লোকের জীবন যেন
বন্দী লোহার খাঁচা-
মন্দ লোকে স্বাধীন চলে
হাসি খুশি নাচা!
একেবারেই ভুলে গেছে
নরক থেকে বাঁচা!
শোনো শোনো বাছা
শুনতে একটু মন্দ হলেও
কথা কিন্তু হাছা!

স্মরনকালের ভয়াবহ বন্যা

-ডা. সুলতান আহমদ

দ্বিতীয় স্বাধীনতা ও বিজয়ের পর
গঠিত হলো অন্তর্বর্তী সরকার।
শুরু হলো দেশ গড়ার সংস্কার।
যে দিকে তাকাও কালো টাকার খনি
দিক-বেদিক ধরা খেল দেশেরও খুনি।

দেশটা যখন নতুন দিগন্তের সূচনায়
দেশটাকে ডুবাল বন্যায়।
বাঁধ খুলে পানি ছেড়ে মজা পেতে চাও?
জেনে রাখো! মহান আল্লাহ করবে পাকড়াও।

ফেনী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী, মৌলভী বাজার,
হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট, লক্ষ্মীপুর, কক্সবাজার-
ঘর-বাড়ি, সহায়সম্পদ গেল ভেসে, শুধু হাহাকার।

শিশু ভাসে, গর্ভবতী মা বাঁচতে চাই, করে চিৎকার
দোতলা, তিনতলায় পানি, শিশুর আর্তনাদ ছাদের ওপর
কত সংগঠন, ছাত্রদের স্বেচ্ছাশ্রম, করছে উদ্ধার
ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ শুধু একটু বাঁচাবার।

তবুও কতজন গেল ভেসে নীড় হারা সবে
স্বজন হারা ব্যথায় ব্যথিত সুখ পাবে কবে?
আওয়াজ উঠেছে বাঁধের মুখে বাঁধ
বুঝাতে হবে বাঁধের কত স্বাদ!

হে আল্লাহ বাঁচাও দেশ, দাও সু-দৃষ্টি
বিপদে দিয়োনা ঠেলে, আমরা যে তোমারই সৃষ্টি।

★ *বরেণ্য কবি, রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।*
★ *বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।*

জমঈয়ত সংবাদ

কুষ্টিয়া জেলা জমঈয়তের কাউন্সিল সম্পন্ন

সম্প্রতি (২৭/৪/২৪) কুষ্টিয়া জেলার পাথরবাড়িয়া হিজলাকর দাখিল মাদরাসা মিলনায়তনে জেলা জমঈয়তের কাউন্সিল অধিবেশন আয়োজন করা হয়। জেলা আহ্বায়ক উপাধ্যক্ষ মো. শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব ড. সাইফুল্লাহ আল খালিদের পরিচালনায় এ অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক এবং প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী। নেতৃবৃন্দের আলোচনার পর উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মতামতের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে কুষ্টিয়া জেলা জমঈয়ত গঠন করা হয়। **কমিটির বিবরণ–**

সভাপতি- উপাধ্যক্ষ মো. শহিদুল ইসলাম, সহ-সভাপতিবৃন্দ- মাওলানা মো. মিযানুর রহমান, মাওলানা মো. মেহদী হাসান, মো. আলতাফ হোসেন ও মো. রফিকুল ইসলাম, সেক্রেটারি- ড. সাইফুল্লাহ আল খালিদ, কোষাধ্যক্ষ- মো. নাসির উদ্দিন মোল্লা, সহকারী সেক্রেটারি- মো. আরাফাত আলী ও মাওলানা আব্দুল জলীল, সাংগঠনিক সেক্রেটারি- মাওলানা আব্দুর রউফ খোকন, দাওয়াহ ও তাবলীগ সম্পাদক- মাওলানা শফিকুর রহমান, তা'লীম ও তারবিয়াত সম্পাদক- মাওলানা মোতালেব হোসেন, প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক- মো. মহিউদ্দীন, শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক- মাওলানা মো. শরিফুল ইসলাম, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক- মো. রবিউল্লাহ, সমাজসেবা ও জনকল্যাণ সম্পাদক- মো.আরমান আলী, পাঠাগার সম্পাদক- মো. ফজলুর রহমান বিশ্বাস, দফতর সম্পাদক- মো. রতন শেখ, কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দ- মো. আরিফুল ইসলাম, কাজী জাকির হোসেন, মো. রবিউল ইসলাম, মো. রেজাউল করীম পলাশ, শাইখ আব্দুল্লাহ সালাফী, মো. আকরাম হোসেন, মো. সাইফুল ইসলাম, মো. মামুন অর রশীদ, মো. জিল্লুর রহমান, মো. উজ্জল শাহ, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মো. ওবায়দুল ইসলাম, ডা. সাদিকুল ইসলাম সুমন, মো. হযরত আলী, মো. হারুন অর রশীদ, মো. একরামুল হক, মো. ফারুক হুসাইন, মো. নিজাম উদ্দীন, মো. খাইরুল ইসলাম।

কাঞ্চন এলাকা জমঈয়তের কাউন্সিল

গত ২৫ আগস্ট শনিবার বাদ আসর কাঞ্চন কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে কাঞ্চন এলাকা জমঈয়তের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন এলাকা জমঈয়তের সভাপতি আলহাজ্জ আব্দুস সালাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক, উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার আহসান, আব্দুল রব। উক্ত অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের অন্যতম সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী। কেন্দ্রীয় জমঈয়তের দাওয়াহ ও মিডিয়া বিষয়ক সম্পাদক শাইখ মাসউদুল আলম আল উমরী, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি শাইখ ইকবাল হাসান। সহ-সেক্রেটারি শাইখ আবুল হোসেন, দাওয়াহ ও তাবলীগ বিষয়ক সম্পাদক শাইখ হাফেয জুলফিকার আলী, জেলা শুব্বান সেক্রেটারি ও 'আম সদস্য শাইখ রমজান মিয়া, রূপগঞ্জ থানা শুব্বান সভাপতি শাইখ খলিলুল্লাহ মোল্লা প্রমুখ।

নতুন কমিটি তালিকা: সভাপতি- আলহাজ্জ আব্দুল সালাম। সহ-সভাপতি- মো. ফিরোজ, মাষ্টার আব্দুল মমিন, কবির হোসেন। সেক্রেটারি- শাইখ হাফেয জুলফিকার আলী। সহকারী সেক্রেটারি- আলিমুল্লাহ মিয়া। কোষাধ্যক্ষ- আব্দুল কাইয়ুম। সাংগঠনিক সম্পাদক- আমানুল্লাহ আনু। দাওয়াহ ও তাবলীগ সম্পাদক- হাজী ইব্রাহীম। প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক- মাওলানা আকবর আলী। শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক- হাফেয জায়েদ মোল্লা। মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক- হাজী জহির উদ্দিন। সমাজ সেবা ও জনকল্যাণ সম্পাদক- মো. আফজাল হোসেন খোকা। পাঠাগার সম্পাদক- আমির হোসেন। দফতর সম্পাদক- অলিউল্লাহ।

সদস্যবৃন্দ: আব্দুল হালিম, হাজী হাবিবুর রহমান, মাহফুজ মোল্লা, আব্দুর রহীম ভূঁইয়া, দেওয়ান মোস্তফা, আবুল কালাম, আব্দুর রহমান মুন্সী, মো. রুহুল আমিন, আমিনুল ইসলাম, আব্দুল হাই, আবুল হোসেন ও ইয়াকুব।

হাফেজা আবশ্যক

শরীফুন্নেসা মহিলা দাখিল মাদ্‌রাসা, শরীফবাগ, ধামরাই, ঢাকা

(প্রতিষ্ঠাতা– আলহাজ্জ মো. তমিজউদ্দিন)

ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলা সন্নিকটস্থ শরীফবাগ গ্রামে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত শরীফুন্নেসা মহিলা দাখিল মাদ্‌রাসার হিফজুল কুরআন বিভাগে সন্তোষজনক বেতন ও আকর্ষণীয় সুবিধায় একজন হাফেযা শিক্ষিকা নিয়োগ দেয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদেরকে দ্রুত যোগাযোগের অনুরোধ জানানো হলো।

যোগাযোগ– অধ্যক্ষ

মোবাইল: ০১৭৬৯০১৭৭২০

স্বাস্থ্য-সচেতনতা

যে অভ্যাসগুলো মানুষকে দুর্বল করে তুলছে

মানুষ সামাজিক জীব। তাই একা থাকলে অনুপ্রেরণার অভাব অনুভব করে। আর তখনই কিছু অভ্যাসের দেখা দেয়। যা কি-না দুর্বল করে তুলে। এসব অভ্যাস আমাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। তাই আজই নিজেকে এসব বদভ্যাস থেকে মুক্তি দিন। আপনি চাইলেই কিছু শৃঙ্খলার মেনে চলার মধ্যমে এগুলো কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

অলস জীবনধারা: শারীরিক ক্রিয়াকলাপের অভাবে অলসতা বোধ করতে পারেন। এতে আপনার সামগ্রিক সুস্থতা কমবে। সারাক্ষণ বসে থাকলে বা কর্মহীন অবস্থায় থাকলে স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। নিয়মিত শরীরচর্চা আপনার শক্তির মাত্রা বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনার মন থাকবে চাঙ্গা। শারীরিক ও মানসিকভাবে আপনি সুস্থ থাকবেন।

ফোনে বেশি সময় কাটানো: স্ক্রিনে অতিরিক্ত পরিমাণে সময় ব্যয় করা যাবে না। এতে চোখ ও মাথা ব্যাথা করবে। ফলে মেজাজ থাকবে খারাপ। স্ক্রিন থেকে নির্গত নীল আলো মারাত্মক ক্ষতিকর। এতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে। তাই সারাদিন ফোন নিয়ে সময় কাটানো উচিত নয়। অন্যান্য কাজেও নিজেকে ব্যস্ত রাখুন।

অপর্যাপ্ত ঘুম: অপর্যাপ্ত ঘুম সবার জন্যই খারাপ। রাত জেগে থাকা, অনিয়মিত ঘুমের অভ্যাস, ঘুমাতে যাওয়ার আগে বা পরে ডিভাইসের ব্যবহার ঘুমে সমস্যা করতে পারে। তাই রাতে ডিভাইসগুলো থেকে দূরে থাকুন। একটি আরামদায়ক ঘুমের পরিবেশ তৈরি করুন। ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় এমন পানীয়ও বর্জন করতে হবে।

অস্বাস্থ্যকর ডায়েট: প্রক্রিয়াজাত খাবার, পরিশোধিত শর্করা এবং অস্বাস্থ্যকর চর্বিযুক্ত খাবার খেলে আপনি অলস বোধ করবেন। এই খাবারগুলোতে প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব রয়েছে। তাই ফলমূল, শাকসবজি, শস্য এবং চর্বিযুক্ত প্রোটিন সমৃদ্ধ সুষম ডায়েট খুব গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও নিজেকে হাইড্রেটেড রাখুন। চিনিযুক্ত পানীয় এবং অ্যালকোহল থেকে নিজেকে বিরত রাখুন।

সামাজিক বিচ্ছিন্নতা: নিজেকে সামাজিক ভাবে বিচ্ছিন্ন রাখলে একাকীত্বে ভুগবেন। অন্যের সাথে সংযোগ স্থাপন নিজের মঙ্গলের জন্য অপরিহার্য। বন্ধু এবং পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখুন। সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অংশ নিন। অর্থপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলুন। *[সূত্র: এনটিভি অনলাইন]*

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ফিটকিরির ব্যবহার

অ্যালুমিনিয়াম সালফেট ও পটাশিয়াম সালফেট দিয়ে তৈরি প্রাকৃতিক লবণ ফিটকিরি। এর রাসায়নিক নাম পটাশ অ্যালাম। রং শুভ্র সাদা। ফিটকিরি কিন্তু বহু গুণে গুণান্বিত। বহু শতাব্দী ধরে এটি আয়ুর্বেদশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে, পানি জীবাণুমুক্ত করতে, বগলের দুর্গন্ধ দূর করতে ফিটকিরি বেশ কাজে দেয়। আজ আমরা জানব ফিটকিরির কিছু **উপকারিতা:**

বগলের দুর্গন্ধ দূর করে: অতিরিক্ত ঘাম থেকে শরীরে দুর্গন্ধ হয়, বিশেষ করে বগলের দুর্গন্ধের জন্য দায়ী হলো অতিরিক্ত ঘাম। বগলের দুর্গন্ধ নিয়ে অনেক সময় বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। ফিটকিরিতে ঘাম কমানোর আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। গোসলের পর ফিটকিরি বগলে ঘষে নিন, দেখবেন দুর্গন্ধ দূর হবে। আর কৃত্রিম ক্ষতিকর ডিওডোরেন্ট ব্যবহার করা লাগবে না।

মুখের দুর্গন্ধ দূর করে: মুখে দুর্গন্ধের কারণে অনেক সময় কর্মস্থলে বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়। এজন্য ফিটকিরি-মিশ্রিত পানি দিয়ে কুলকুচি করতে পারেন। এক গ্লাস গরম পানিতে এক গ্রাম ফিটকিরি ও এক চিমটি শিলা লবণ (রক সল্ট) যোগ করে ভালোভাবে গুলিয়ে নিন। এখানে একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। ভুলে আবার পানি গিলে ফেলবেন না যেন। এতে আপনার বমির উদ্রেক হতে পারে।

দাঁতের রক্তপাত বন্ধ করে: খাবার খাওয়ার পর দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে জমে তা থেকে ব্যাকটেরিয়া জন্মে। এই ব্যাকটেরিয়ার কারণে মাড়ি ফুলে গিয়ে দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। ফিটকিরি এই সমস্যা দূর করতে পারে। এক গ্রাম ফিটকিরি, এক চিমটি দারুচিনি ও কিছু শিলা লবণ মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে নিন। মাড়িতে আলতোভাবে ম্যাসাজ করুন এবং কুলকুচি করে পানিটা ফেলে দিন। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে আর ঘুমাতে যাওয়ার আগে এভাবে কুলকুচি করলে ভালো ফল পেতে পারেন।

নাক দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ করে: বরফপানিতে একটি তুলার বল ভিজিয়ে তাতে এক গ্রাম ফিটকিরি ছিটিয়ে দিন এবং কয়েক সেকেন্ডের জন্য তুলার বলটি নাকের ছিদ্রে চেপে ধরুন, দেখবেন রক্ত পড়া বন্ধ হবে। কিন্তু এ সময়ে নাকের উভয় ছিদ্র বন্ধ করবেন না।

পানি জীবাণুমুক্ত করে: এখন তো পানি জীবাণুমুক্ত করার বিভিন্ন উপায় আছে। কয়েক যুগ আগেও পানি জীবাণুমুক্ত করতে ফিটকিরি ব্যবহার করা হতো। ফোটানো পানিতে এক চিমটি ফিটকিরি ছেড়ে দিন, পানি জীবাণুমুক্ত হয়ে যাবে। এবার নিশ্চিন্তে পান করুন।

মুখের ঘা দূর করে: মুখে ঘা হলে ফিটকিরি লাগাতে পারেন। জ্বালাপোড়া হতে পারে, কিন্তু মুখের ঘা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে।

প্রাকৃতিক টোনার হিসেবেও কাজ করে: শরীরের কোথাও কেটে গেলে ফিটকিরি লাগিয়ে নিন, দেখবেন সঙ্গে সঙ্গে রক্তপাত বন্ধ হয়ে যাবে। কুঁচকে যাওয়া ত্বকে লাগালে ত্বক টান টান হবে। পাশাপাশি ত্বকে প্রাকৃতিক আভা ফিরে আসবে। এটা প্রাকৃতিক টোনার হিসেবেও কাজ করে। বিশেষ করে যাঁদের বয়স পঞ্চাশের আশপাশে, তাঁরা এটি ব্যবহার করে দেখতে পারেন। *[সূত্র: প্রথম আলো অনলাইন]*

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্'আত, প্রত্যেকটি বিদ্'আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১): ***আমার বয়স ত্রিশ বত্রিশ হবে। এত কম বয়সে আমার চুল দাড়ি অনেক পেকে গেছে? যেহেতু আমি বুড়া হয়ে যাইনি, তাই আমার জন্য কি চুল কালো করা উচিত হবে?*** *জুবায়ের আহমেদ, ফরিদাবাদ, ঢাকা।*

জবাব: না, আপনার জন্যে চুলে কালো রং করা জায়িয হবে না। এখানে বয়স কোনো বিষয় না অর্থাৎ- বয়সের কারণে হুকুম ভিন্ন হবে না। রাসূল (ﷺ) বলেছেন: শেষ যামানায় একদল লোক কবুতরের বুকের কালো রং-এর মতো করে কালো রং দ্বারা চুল কালো করবে, তারা জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না– *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪২১২; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৫০৭৫, সহীহ)*। এই হাদীসে কোনো বয়সের কথা নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাছাড়া এটা এক ধরনের ধোঁকা, আর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: যে আমাদের সাথে প্রতারণা করবে সে আমাদের দলভুক্ত না– *(সহীহ মুসলিম- হা. ১০২)*। তবে আপনি চাইলে লাল, ব্রাউন ও হলুদ কালার করতে পারবেন– *(দেখুন: সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪২১১)*।

জিজ্ঞাসা (০২): ***মসজিদে জামা'আতে সালাত পড়তে গিয়ে মাঝে মাঝে দেখি কাতারের দুই পাশে জায়গা নেই, আবার কোনো লোক নেই আমার সাথে দাঁড়ানোর। এমন অবস্থায় কি আমি কাতারের পিছনে একাই দাঁড়াব না-কি সামনে থেকে কাউকে পিছনে টেনে নিয়ে দু'জনে কাতার করব? কুরআন হাদীসের আলোকে দয়া করে জানাবেন।***

আব্দুর রউফ, জামালপুর।

জবাব: বিনা প্রয়োজনে ইমামের পিছনে একাকী সালাত পড়লে তার সালাত বিশুদ্ধ হবে না। নবী (ﷺ) এক লোককে কাতারের পিছনে সালাত পড়তে দেখলেন, অতঃপর সে যখন সালাত শেষ করল, তখন তাকে তিনি বললেন: তুমি আবার সালাত পড়ো; কাতারের পিছনে একাকীর সালাত বিশুদ্ধ নয়– *(মুসনাদে আহমাদ- হা. ১৫৮৬২, হাসান; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৬৮২; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৩০)*। তবে প্রয়োজন হলে যেমন সামনের কাতারে যদি ফাঁকা জায়গা না থাকে, অথবা একমাত্র মহিলা, যে মহিলা হওয়ার কারণে পুরুষদের কাতারে দাঁড়াতে পারবে না, তাহলে সে সময় প্রয়োজনের কারণে কাতারের পেছনে একাকী সালাত পড়া যাবে। নবী (ﷺ)-এর ইমামতিতে একজন মহিলা কাতারের পিছনে একাকী সালাত পড়েছিলেন– *(সহীহুল বুখারী- হা. ২৩৪ ও সহীহ মুসলিম- হা. ৬৫৮)*। সামনের থেকে কাউকে পিছনে টেনে আনা বৈধ নয়। কারণ এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ নয়।

জিজ্ঞাসা (০৩): ***আমার আব্বু বিদেশ থাকে। আমি তার কাছে টাকা চাইলে তিনি বিকাশে টাকা পাঠান। কিন্তু তিনি ৫০০০ টাকা পাঠালে আমি বিকাশের দোকানে টাকা তুলতে গেলে তারা আমাকে পুরোপুরি ৫০০০ টাকা দেয় না একশত টাকা কেটে রাখে? এটা কি জায়িয? আশা রাখি জবাব দিয়ে উপকৃত করবেন।*** *আনোয়ার হুসাইন*

সিরাজগঞ্জ সদর

জবাব: বিকাশ বা অন্যান্য মোবাইল ব্যাংকিং থেকে টাকা তুলতে গেলে তারা যে পদ্ধতিতে টাকা কেটে রাখে সেটা সম্পূর্ণ হারাম; কারণ তা সুদ। আপনার মোবাইল একাউন্টে আপনার বাবা পাঠাল ৫,০০০ টাকা, আপনি সেই ৫,০০০ টাকা বিকাশের দোকানদারের একাউন্টে পাঠালেন অথচ সে আপনাকে দিচ্ছে ৪,৯০০ টাকা। ফলাফল দাঁড়াল ৫,০০০ টাকা দিয়ে আপনি ৪,৯০০ টাকা নিলেন। আর এটাকে শরিয়তের ভাষায় সরফ বলে। সরফে এক জাতীয় মুদ্রা কম বেশি করে লেনদেন করা, যা হারাম। নবী (ﷺ) স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রার ক্ষেত্রে সমজাতীয় মুদ্রা এভাবে কম বেশি করে লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন এবং সেটাকে সুদ বলেছেন– *(দেখুন: সহীহুল বুখারী- হা. ২১৭৫; সহীহ মুসলিম- হা. ১৫৮৪)*। আর কাগজি মুদ্রার হুকুম একই। তাই বিকাশের এ লেনদেন হারাম। তবে যদি বিকাশ ও অন্যান্য মোবাইল ব্যাংকিং তাদের সেবা প্রদানের জন্য প্রকৃত সেবা চার্জ গ্রহণ করে সেটা বৈধ। কিন্তু তারা যেটা গ্রহণ করে তা প্রকৃত সেবা চার্জ নয়। কারণ প্রকৃত সেবা চার্জ হলে তা টাকার পরিমাণ ভেদে কম বেশি হতো না; বরং একবার ক্যাশ

আউট করতে প্রকৃত যে সময় ও সেবা ব্যয় হয় তার ওপর ভিত্তি করে চার্জ নির্ধারণ হতো। উদাহরণস্বরূপঃ একবার টাকা তুললে বা ক্যাশ আউট করলে প্রকৃত সেবা অনুযায়ী চার্জ নির্ধারিত হবে ২০ টাকা, কত টাকা ক্যাশ আউট হলো সেটার পরিমাণ দেখে নির্ধারণ করা যাবে না। সেটা করলে রিবাল ফযল হয়ে যাবে; কারণ এক হাজার টাকা একবারে তুলতে তাদেরকে যে সময় ও সেবা প্রদান করতে হয় পাঁচ হাজার টাকা একবারে তুলতেও তাদেরকে একই সময় ও সেবা প্রদান করতে হয়। অথচ তারা এক হাজারে বিশ টাকা গ্রহণ করে আর পাঁচ হাজারে একশত টাকা গ্রহণ করে। এটাই প্রমাণ করে যে, তারা যে টাকাটা গ্রহণ করে তা সুদ। অতএব বিকাশের এই লেনদেন হারাম।

জিজ্ঞাসা (০৪): ***রাসূল (ﷺ) কতজন ইয়াহুদী সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তারা যদি আমার অনুসরণ করতো তবে এ ভূ-পৃষ্ঠে কোনো ইয়াহুদী মুসলিম হওয়া ব্যতীত অবশিষ্ট থাকত না?*** *আব্দুল মু'মিন, সিলেট।*

জবাব: দশজন। নবী (ﷺ) বলেন: যদি ইয়াহুদীদের দশজন আমার অনুসরণ করত তাহলে ভূ-পৃষ্ঠে মুসলিম হওয়া ছাড়া কোনো ইয়াহুদী অবশিষ্ট থাকত না– *(সহীহ মুসলিম- হা. ২৭৯৩)*। হাদীসে এসেছে– যদি দশজন ইয়াহুদী আমার প্রতি ঈমান আনত তাহলে আমার প্রতি সকল ইয়াহুদী ঈমান আনত– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩৯৪১)*। এখানে এ দশজন দ্বারা তৎকালীন সুনির্দিষ্ট দশজন নেতৃস্থানীয় ও পাদ্রী ইয়াহুদী উদ্দেশ্য। এটা দারা তাদের মর্যাদা বুঝানো হয়নি; বরং উদ্দেশ্য ইয়াহুদীদের ঈমান না আনার অপরাধ এই দশজনের ওপর। তাছাড়া আমরা জানি, হাজার হাজার ইয়াহুদী আমাদের নবীর প্রতি ঈমান এনেছিল।

জিজ্ঞাসা (০৫): ***বন্যার্ত বা অন্যান্য দুর্যোগগ্রস্তদের জন্য সংগ্রহকৃত ত্রাণের মাল ও টাকা থেকে স্বেচ্ছাসেবীদেরকে খাওয়ার জন্য কিছু দেওয়া কি বৈধ? অথবা তারা নিজেরা কি সেটা থেকে খেতে পারবে?*** *আবুল কালাম, ফেনী।*

জবাব: যেহেতু তারা স্বেচ্ছাসেবী অর্থাৎ- কোনো পারিশ্রমিক না নেওয়ার শর্তে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কাজ করছে সেহেতু তাদের জন্য ত্রাণের মাল থেকে খাওয়া বা গ্রহণ করা অথবা তাদেরকে ত্রাণের মাল থেকে কিছু দেওয়া বৈধ হবে না। কারণ দাতারা তাদের খাওয়ার জন্য দেয়নি; কিন্তু দাতা যদি স্বেচ্ছাসেবকদের খাওয়ার অনুমতি দেয় তাহলে অসুবিধা নেই। তবে স্বেচ্ছাসেবক না পাওয়া গেলে শ্রমিক দিয়ে কাজ করিয়ে তাদেরকে শ্রম অনুয়ায়ী নায্য পারিশ্রমিক প্রদান করা বৈধ। এ ক্ষেত্রে দাতার অনুমোদন না থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই; কারণ এটা না হলে জনকল্যাণ ব্যাহত হবে।

জিজ্ঞাসা (০৬): ***নবী (ﷺ) মি'রাজের রাতে বিভিন্ন আসমানে বিভিন্ন নবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। আমার প্রশ্ন হলো– তিনি কোন আসমানে কোন নবীকে দেখেছিলেন? আর তিনি নবীদেরকে তাদের মৃত্যুর পর কিভাবে দেখলেন?*** *মুস্তাকিম আহমেদ, কাহেণ্টুলি, ঢাকা।*

জবাব: প্রথম আসমানে আদম (আলাইহিস সালাম), দ্বিতীয় আসমানে ইয়াহইয়া (আলাইহিস সালাম) ও 'ঈসা (আলাইহিস সালাম), তৃতীয় আসমানে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম), চতুর্থ আসমানে ইদ্রীস (আলাইহিস সালাম), পঞ্চম আসমানে হারুন (আলাইহিস সালাম), ষষ্ঠ আসমানে মূসা (আলাইহিস সালাম) ও সপ্তম আসমানে ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩২০৭; সহীহ মুসলিম- হা. ১৬২)*। নবী (ﷺ) 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে বাদে যাদেরকে দেখেছিলেন তাদের রুহ্‌কে আল্লাহ তা'আলা দেহতে পরিণত করে দিয়েছিলেন, আর এভাবে তিনি তাদেরকে দেখেছিলেন। তাদের দুনিয়াতে যে দেহ ছিল সেটা তাদের কবরে আছে– *(মাজমূউল ফাতাওয়া- ৪/৩২৮)*। নবীদের লাশ আল্লাহ তা'আলা মাটির ওপর হারাম করে দিয়েছেন। মাটি তা খেতে পারে না।

জিজ্ঞাসা (০৭): ***আমার অফিস মতিঝিলে। অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে প্রায় প্রতিদিন মাগরিবের সালাতের সময় কাযা হয়ে যায়। বিধায় আমি তা 'ইশার সালাতের সাথে জমা করি। এভাবে প্রতিদিন করলে আমাকে গুনাগার হতে হবে কি? তাছাড়া এর সমাধানই বা কী?*** *আশিকুর রহমান*

বোর্ড বাজার, গাজীপুর।

জবাব: মাগরিবের আযান হলে যদি রাস্তার আশে পাশে মসজিদ থাকে এবং বাহন থেকে নামা সম্ভব হয় তাহলে বাহন থেকে নেমে মাগরিব পড়ে তারপর বাড়িতে যান। এমতাবস্থায় বিলম্ব করে সালাতের টাইমের পরে সালাত পড়া ঠিক হবে না; কারণ নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা ফর্‌য– *(সূরা আন্ নিসা: ৩)*। আর যদি রাস্তার আশে পাশে মসজিদ না থাকে অথবা বাহন থেকে নামা সম্ভব না হয়, তাহলে আপনি বাড়িতে গিয়ে 'ইশার সালাতের সাথে মাগরিবের সালাত জমা করে পড়তে পারবেন। এভাবে প্রতিদিন জমা করলে আপনার গুনাহ হবে না। বাড়িতেও প্রয়োজনে সালাত জমা করে পড়া যায়– *(মুসলিম- হা. ৭০৫)*।

জিজ্ঞাসা (০৮): ***ঈমান ও ইয়াকীন-এর মধ্যে পার্থক্য কী? ঈমান ও ইয়াকীনের প্রকার বা স্তরবিন্যাস জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।*** *নূরুজ্জামান খান, পটুয়াখালী।*

জবাব: ইয়াকীন হলো পরিপূর্ণভাবে জানার নাম, যার মধ্যে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কেউ কেউ বলেন: ইয়াকীন হলো কোনো কিছু মনের মধ্যে এমনভাবে গেঁথে যাওয়া, যেন তা চোখে দেখা জিনিসের মতো সত্যে পরিণত হয়; ফলে তার মধ্যে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ইয়াকীন হলো ঈমানের চূড়ান্ত স্তর, আর সেটাই হলো ইহসানের স্তর– *(মাদারিজুস সালিকীন- ২/৩৯৯)*। অতএব ইয়াকীন হলো– ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর। ইবনুল কায়্যিম বলেন: ঈমান যদি হয় দেহ, তাহলে ইয়াকীন হলো সেই দেহের আত্মা– *(মাদারিজুস সালিকীন- ২/৩৯৭)*। ইয়াকীন-এর স্তর তিনটি। যথা- **প্রথম স্তর:** ইলমুল ইয়াকীন, যেমন- আপনি কাবাঘর সম্পর্কে শুনলেন, জানলেন এবং বিশ্বাস করলেন। **দ্বিতীয় স্তর:** আইনুল ইয়াকীন, যেমন- আপনি সরাসরি কাবাঘর দেখলেন। **তৃতীয় স্তর:** হাক্কুল ইয়াকীন, যেমন- আপনি কাবাঘর স্পর্শ করে দেখলেন এবং তাওয়াফ করলেন। আর ঈমানের স্তরও তিনটি। যথা- **নিম্ন স্তর:** মুতলাকুল ঈমান। এ স্তরের ঈমানদার জাহান্নামে গেলেও তার ঈমানের কারণে একদিন না একদিন বের হবেই, এ স্তরের ঈমান তাকে স্থায়ী জাহান্নামী হওয়া থেকে রক্ষা করবে। **মধ্যম স্তর:** আল ঈমান আল মুতলাক আল ওয়াজিব। এ স্তরের ঈমান তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে এবং হিশাব-নিকাশের পর সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। **উচ্চ স্তর:** আল ঈমান আল মুতলাক আল কামেল আল ওয়াজিব ওয়াল মুসতাহাব। এ স্তরের ঈমান তাকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

জিজ্ঞাসা (০৯): যাদের বিদেশে যাতায়াত আছে, তারা সেখান থেকে আসার সময় ব্যবসায়িক উদ্দেশে বিভিন্ন পণ্য নিয়ে আসে (যেমন- মোবাইল ফোন, সোনার বার ইত্যাদি)। আমার প্রশ্ন হলো– সরকারি শুল্ক ফাঁকি দিয়ে বিভিন্ন দেশ থেকে পণ্য এনে এভাবে ব্যবসা করলে তা হালাল হবে কি?

আল আমীন, পাংশা, রাজবাড়ি।

জবাব: **প্রথমতঃ** ইসলামের বিধান হলো– যখন কোনো মুসলিম বাহির থেকে মাল আমদানি করবে তখন সরকার তার থেকে কোনো শুল্ক গ্রহণ করবে না, নবী (ﷺ) বলেছেন: শুল্ক গ্রহণকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না– *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২৯৩৭, হাসান লি গাইরিহি)*। তবে যদি সরকারের অভাব থাকে অথবা আমদানিকৃত পণ্যের পেছনে ফ্রি সেবা প্রদানের সামর্থ্য সরকারের না থাকে, তাহলে সেবা প্রদানের বিনিময় হিসেবে যদি শুল্ক গ্রহণ করে তবে তা বৈধ। **দ্বিতীয়তঃ** তারা ফিরে আসার পথে যে মোবাইল ফোন, সোনার বার ইত্যাদি নিয়ে আসে যদি সেগুলো এমন পরিমাণের হয়, যে পরিমাণ মাল নিজের সাথে বহন করার অনুমতি সরকার বিদেশ থেকে প্রত্যাগমনকারীকে দিয়ে রেখেছে তাহলে সে পরিমাণ নিয়ে এসে নিজে ব্যবহার করতে পারে আবার ব্যবসাও করতে পারে। আর যদি ঐ পরিমাণ নিজের সাথে বহনের অনুমতি না থাকে তাহলে তা চোরা-কারবারির অন্তর্ভুক্ত হবে যা হারাম, তাই এভাবে ব্যবসা করা হালাল হবে না। তবে যদি সরকার অথবা কাস্টম কর্তৃপক্ষ অন্যায়ভাবে শুল্ক আরোপ করে তাহলে তাদের অন্যায় এড়িয়ে ব্যবসা করা সম্ভব হলে তা হালাল হবে।

জিজ্ঞাসা (১০): আমার স্ত্রী ঠিক মতো সালাত আদায় করে না। আমি শুনেছি– স্ত্রী যদি সালাত আদায় না করে তবে অটো তালাক হয়ে যায়, কেননা বে-নামাযী কাফির। এ বিষয়ে সঠিক সমাধান দিয়ে কৃতার্থ করবেন।

জুয়েল রানা

গুরুদাসপুর, নাটোর।

জবাব: বে-নামাযী ও যে ঠিক মতো সালাত আদায় করে না, তারা উভয়ে সমান না। একদল আলেম বে-নামাযীকে কাফির বলেছেন, কুরআন হাদীসের আলোকে এমতটিই আমাদের কাছে বেশি শক্তিশালী মনে হয়। তাই মুসলিমের বে-নামাযীর বউ এই মতের আলোকে অটো তালাক হয়ে যাবে। আর যিনি ঠিক মতো সালাত আদায় করেন না, মাঝে মাঝে আদায় করেন, তার ক্ষেত্রে অধিকাংশ আলেমের মত হলো– সে কাফির নয়; বরং কবীরা গুনাহকারী, কুরআন হাদীসের আলোকে আমাদের কাছে এ মতটি বেশি শক্তিশালী। অতএব আপনার স্ত্রী অটো তালাক হয়নি। সমাধান হলো– আপনি তাকে নসীহা করবেন, কাজ না হলে চাইলে তাকে তালাক দিতে পারেন।

জিজ্ঞাসা (১১): আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে আমি সময় মতো আমার সন্তানের 'আক্বীক্বাহ্ দিতে পারিনি। এখন আমার সন্তানের বয়স ৯ বছর। আমি কি এখন আমার সন্তানের 'আক্বীক্বাহ্ দিতে পারব? জানালে উপকৃত হব।

বিল্লাল হোসেন, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

জবাব: আপনি চাইলে এখন আপনার সন্তানের 'আক্বীক্বাহ্ দিতে পারবেন। কারণ সপ্তম দিনে 'আক্বীক্বাহ্ করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। কারণ যে হাদীসে সপ্তম দিনে 'আক্বীক্বার কথা বলা হয়েছে সেই হাদীসে সপ্তম দিনে নাম রাখার কথাও বলা হয়েছে– *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২৮৩৮)*। অথচ মহান আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সপ্তম দিনের আগে তার সন্তানের নাম রেখেছিলেন– *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৩১২৬)*।

তাছাড়া অনেক হাদীসে মুতলাকভাবে 'আক্বীক্বার কথা বলা হয়েছে।

জিজ্ঞাসা (১২): ***আন তা'বুদাল্লাহ কাআন্নাকা তারাহ্– সালাতে যখন এই কল্পনা করি, তখন মানসপটে আল্লাহ তা'আলার এক ধরনের আকৃতি খোঁজার চেষ্টা করি। এটা কি শয়তানের অস্ওয়াসা, না-কি আমি সঠিক পথে আছি?***

ইবাদুর রহমান কাজল, উত্তরা, ঢাকা।

জবাব: আল্লাহর আকৃতি আছে সত্য কিন্তু তার আকৃতি কল্পনা করা বা খোঁজা হারাম, যা অনেক সময় শয়তানের অস্ওয়াসা থেকে হয়। আল্লাহ আমাদের কল্পনাকৃত আকৃতির উর্ধ্বে; কারণ তার মতো কিছুই নেই– *(সূরা আশ্ শূরা-: ১১)*।

জিজ্ঞাসা (১৩): ***যারা রুকিয়াহ করেন, তারা অনেক সময় বলেন যে, এটা জীনের আছর অথবা বলেন, আপনার সন্তানের বদ নজর লেগেছে বা তাকে যাদু করা হয়েছে। তাদের এই বলা কি অনুমান নির্ভর, না-কি সঠিকভাবে বলতে পারেন?*** *জান্নাতুল ফেরদৌস জেবা, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।*

জবাব: না, এটা অনুমান নির্ভর নয়; বরং বদ নজর লাগলে সেটার উপসর্গ প্রকাশ পায়। জীনে ধরলেও তার উপসর্গ প্রকাশ পায়। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা উপসর্গ দেখে নির্ণয় করতে পারেন যে, বদ নজর লেগেছে না-কি জিন্ ধরেছে। তাই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি সঠিকভাবে বলতে পারেন।

জিজ্ঞাসা (১৪): ***একজন আলেম আমাকে বলেছেন, প্রতিদিন ন্যূনতম ১০০ বার আস্তাগফিরুল্লাহ পাঠ করলে সকলপ্রকার বিপদ থেকে মুক্ত থাকা যায়। তিনি কি সঠিক বলেছেন? তাছাড়া কুরআন-সুন্নাহয় আস্তাগফিরুল্লাহ পাঠের কোনো ফযীলাত বর্ণিত হয়েছে কি?*** *আদনান আব্দুল্লাহ রামপুরা, ঢাকা।*

জবাব: ইস্তেগফার পাঠ করলে বিপাদপদ থেকে মুক্ত থাকা যায় একথা ঠিক এবং কুরআন সুন্নাহয় ইস্তেগফারের অনেক ফযীলত এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: (নবী হূদ তার ক্বওমকে বলেছিলেন–) হে আমার ক্বওম! তোমরা তোমাদের রবের কাছে ইস্তেগফার করো, অতঃপর তার কাছে তাওবাহ্ করো তাহলে তিনি তোমাদের ওপর পর্যাপ্ত বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির সাথে আরো শক্তি বৃদ্ধি করে দিবেন– *(সূরা হূদ: ৫২)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন: (নূহ্ বললেন,) অতঃপর আমি বললাম, তোমরা তোমাদের রবের কাছে ইস্তেগফার করো, তিনি ক্ষমাশীল, তাহলে তিনি তোমাদের ওপর পর্যাপ্ত বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তিনি তোমাদের সম্পদ ও সন্তান বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তোমাদের জন্য সৃষ্টি করবেন বাগ-বাগিচা ও নদ-নদী– *(সূরা নূহ: ১০-১২)*।

রাসূল (ﷺ) বলেছেন: যে সব সময় ইস্তেগফার পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে সঙ্কট থেকে উদ্ধার করবেন, তাকে দুঃশ্চিন্তা মুক্ত করবেন এবং তাকে এমন রিয্ক দিবেন যা সে ভাবেনি– *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৫১৮)*। হাদীসটির সনদ দুর্বল হলেও এর অর্থ ঠিক আছে। তবে প্রতিদিন ন্যূনতম ১০০ বার আস্তাগফিরুল্লাহ পাঠ করলে সকলপ্রকার বিপদ থেকে মুক্ত থাকা যায়, একথাটি তিনি সঠিক বলেননি। নির্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা বিপদ মুক্তির কথা কুরআন হাদীসে আসেনি। হাদীসে এসেছে– রাসূল (ﷺ) দিনে ৭০/১০০ বার আস্তাগফিরুল্লাহ পাঠ করতেন এটা তার দৈনন্দিন 'আমল ছিল।

জিজ্ঞাসা (১৫): ***জনৈক ব্যক্তির নাম 'লাল চাঁন'। বয়স পঞ্চাশোর্ধ্ব। এখন তিনি জানতে পারলেন যে, তার নামটি ইসলামের দৃষ্টিতে সঠিক নয়। তবে এখন কি তাকে নাম পরিবর্তন করে রাখতে হবে? না করলে কি গুনাহগার হতে হবে?*** *আব্দুল্লাহ আল আমীন, বাঘারপাড়া, যশোর।*

জবাব: তিনি যেটা জানতে পেরেছেন সেটা সঠিক নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে লাল চাঁন নামটি সঠিক না হওয়ার কোনো কারণ নেই। যেসব নামকরণ ইসলাম হারাম ও মাকরুহ করেছে উল্লেখিত নামটি সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়। চাঁন অর্থ চাঁদ, আরবিতে চাঁনকে বলা হয় কমার। আর লাল এর আর আরবি হলো আহমার। লাল চাঁন অর্থ হলো আল কমার আল আহমার। আর ইসলামে কমার নাম নিষিদ্ধ নয়। যুগ যুগ ধরে মানুষ কামরুজ্জামান (কালের চাঁন), কামরুল ইসলাম (ইসলামের চাঁন) ইত্যাদি নাম রেখে আসছে। অতএব তার নাম পরিবর্তন করে রাখতে হবে না এবং তাকে গুনাহগার হতে হবে না।

জিজ্ঞাসা (১৬): ***ইমাম যখন খুত্ববাহ্ প্রদান করে ঐ সময় যদি কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তখন কি সে বসে পড়বে এবং খুত্ববাহ্ শুনবে না-কি দু'রাকআত পড়ে তারপর বসবে এবং খুত্ববাহ্ শুনবে?*** *আব্দুর রহমান, মনিহার, যশোর।*

জবাব: রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাহ হলো যখন কেউ জুমু'আর দিনে ইমামের খুত্ববাহ্ চলাকালীন অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সংক্ষেপে দু'রাকআত পড়ে তারপর বসবে। সরাসরি বসবে না। নবী (ﷺ) বলেছেন: যখন তোমাদের কেউ জুমু'আর দিনে ইমামের খুত্ববাহ্ প্রদানের অবস্থায় মসজিদে আসবে, সে যেন দু'রাকআত পড়ে এবং সংক্ষেপ করে পড়ে। *(সহীহ মুসলিম- হা. ৮৭৫)*

জিজ্ঞাসা (১৭): ***একজন মহিলার পিরিয়ডের দিন শেষ হয়ে গেছে অথচ তার রক্ত বন্ধ হচ্ছে না, সব সময় রক্ত বের হচ্ছে, এখন সে কীভাবে ওযূ ও সালাত পড়বে? দয়া করে কুরআন হাদীসের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।***

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বিক্রমপুর।

জবাব: উক্ত মহিলা যেহেতু বুঝতে পারছে তার পিরিয়ডের দিন কোনগুলো, সেহেতু সে অন্য দিনগুলোতে সালাত পড়বে। আর পিরিয়ডের পরেও যে রক্ত আসছে হাদীসের ভাষায় সেটাকে ইস্তেহাযাহ বলে। সাধারণত জরায়ুর মধ্যে আযেল নামক একটি শিরা শয়তানের আঘাতে জখম হয়ে এ রক্ত নির্গত হয় অথবা কোনোভাবে শিরা ছিড়ে গিয়ে অথবা রোগের কারণে এ রক্ত প্রবাহিত হয়– *(দেখুন: জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১২৮; মুসনাদে আহমাদ- হা. ২৭৬৩১)*। এটা হায়েযের রক্ত নয়। তাই এই দিনগুলোতে তাকে অবশ্যই সালাত পড়তে হবে। আর এই রক্ত বের হওয়ার কারণে তার ওযূ ভঙ্গ হবে না। তাই সালাতের সময় হলে অন্য কারণে তার ওযূ ভঙ্গ হলে ওযূ করে সালাত পড়বে, ইস্তেহাযার কারণে ওযূ করা লাগবে না– *(দেখুন: সহীহুল বুখারী- হা. ৩০৬ ও সহীহ মুসলিম- হা. ৩৩৩)*।

জিজ্ঞাসা (১৮): ***আমি আমার স্ত্রীকে "স্বাধীন বা মুক্ত করে দিলাম বা ছেড়ে দিলাম" কথাগুলো বলছি বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু আমি ১০০% শিউর ছিলাম না। তাই বিভিন্ন আলেমের কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করার সময় বলে ফেলেছিলাম যে, আমি উপরোক্ত কথাগুলো বলেছি। পরে আমার স্ত্রীর সাথে আলোচনা করে জানতে পারলাম যে, আমি উপরোক্ত কথাগুলো বলিনি। আমার এখনো মনে হচ্ছে বলিনি। এখন আমার জানার বিষয় হলো– আমার স্ত্রীর সাথে আলোচনার আগেই বিভিন্ন আলেমের কাছে মাসআলাটা জিজ্ঞাসা করার সময় উপরোক্ত কথাগুলো বলছি বলে যে মাসআলা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাহলে পিছনে উপরোক্ত না বলে থাকলেও মাসআলা জানার সময় বলছি বলাতে কি নতুন করে কোনো তালাক পতিত হবে?***

মো. কামাল, কুমিল্লা।

জবাব: **প্রথমতঃ** আপনার প্রশ্নের অবস্থা থেকে মনে হচ্ছে, আপনি ওসওয়াসা রোগে আক্রান্ত, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করুন। বেশি বেশি ওসওয়াসার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না।

দ্বিতীয়তঃ আপনার স্ত্রীর ওপর কোনো তালাক পতিত হয়নি অনেকগুলো কারণে– **১)** আপনার স্ত্রী নিশ্চিতভাবে আপনার স্ত্রী, আর তাকে তালাক দিয়েছেন কি-না সেটা সন্দেহপূর্ণ। আর ইসলামী শরিয়তে সন্দেহের মাধ্যমে নিশ্চিত বিষয় দূরীভূত হয় না– *(আল আশবাহ ওয়ান নাজায়ের লী ইবনু নুজাইম- পৃ. ৪৭)*। **২)** আপনি যে শব্দগুলো দিয়ে তালাক দেওয়ার সন্দেহ করছেন সেগুলো তালাকের শরিয়াহ বা স্পষ্ট শব্দ নয়; বরং সেগুলো কিনায়াহ বা অস্পষ্ট শব্দ। আর অস্পষ্ট শব্দ দিয়ে তালাক পতিত হওয়ার জন্য শর্ত হলো অন্তরে তালাকের নিয়ত থাকা। আপনি যেহেতু শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন কি-না সেটা নিয়েই সন্দেহ করছেন সেহেতু অন্তরে তালাকের নিয়ত থাকার প্রশ্নই আসে না। অতএব আপনার তালাক পতিত হয়নি– *(সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ৩/২৫৪)*। **৩)** মাসআলা জানার জন্য কিভাবে তালাক দিয়েছে সেটা বর্ণনা করলে তালাক পতিত হবে না, কারণ সে তালাক দেওয়ার উদ্দেশ্যে তালাক শব্দ উচ্চারণ করেনি; বরং কি হয়েছে সেটা বর্ণনা দেওয়ার জন্য শব্দ ব্যবহার করেছে। এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে কোনো বিতর্ক নেই।

জিজ্ঞাসা (১৯): ***আমার একটা জিজ্ঞাসা ছিল, আমার দোকান থেকে টেম্ভারের মাধ্যমে একটি লোকের কাছে কিছু মাল পাঁচলক্ষ টাকায় বিক্রয় করেছি, তিনি দশ হাজার টাকা এ্যাডভ্যান্স/বায়না করেছেন। আমরা তার মাল ডেলিভারি করার জন্য প্রস্তুত করেছি। কিন্তু দু'দিন পর তিনি আর মাল নিতে চাচ্ছেন না এবং যে দশ হাজার টাকা তিনি আমাদেরকে দিয়েছিলেন এক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর তা ফেরত দিতে বলেছেন। এখন যদি মালটা আমি অন্য জায়গায় বিক্রয় করি তাহলে আমার চল্লিশ হাজার টাকা লস হবে। আমার জন্য ঐ দশ হাজার টাকা খাওয়া বৈধ হবে?***

লেমন, ডগাইর।

জবাব: যেহেতু ইজাব কবুলের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছে এবং ক্রেতা বিক্রয় স্থল ত্যাগ করে চলে গেছে সেহেতু এ মাল নেওয়া তার জন্য আবশ্যক। মালের মধ্যে কোনো ত্রুটি না থাকলে কিংবা মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে ঠকে না থাকলে মাল না নেওয়ার সুযোগ ক্রেতার থাকে না– *(দেখুন: সহীহুল বুখারী- হা. ২১১২; সহীহ মুসলিম- হা. ১৫৩১)*। অতএব ক্রেতা যেটা করতে চাচ্ছে এটা তার জন্য হারাম। তবে তার জন্য একটা পথ খোলা আছে, সে বিক্রেতার কাছে ইকালা দাবি করতে পারে অর্থাৎ- বিক্রেতার কাছে ক্রয় ভঙ্গের দাবি জানাতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতার জন্য তার দাবি মেনে নেওয়া মুস্তাহাব– *(দেখুন: সুনান আবূ দাউদ- হা. ৩৪৬০; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২১৯৯)*। আপনি এতে ক্ষতিগ্রস্ত হলে আপনার জন্য ক্রেতা থেকে ক্ষতি পূরণ গ্রহণ করা বৈধ– *(আশ্ শারহুল মুমতি'- ৮/৩৯০)*। অতএব আপনি ইকালা করে উক্ত দশ হাজারসহ আরো যে ত্রিশ হাজার লস হচ্ছে তা আপনি ভক্ষণ করতে পারেন। ❑

ঘানা জাতীয় মসজিদ

–আব্দুল মোহাইমেন সা'আদ*

পশ্চিম আফ্রিকায় অবস্থিত ঘানার রাজধানী আক্রা শহরের একটি মনোমুগ্ধকর স্থাপনা ঘানা জাতীয় মসজিদ। এই মসজিদটি একটি সুন্দর কমপ্লেক্সের অংশ, যেখানে শুধু মসজিদই নয়, রয়েছে একটি স্কুল, গ্রন্থাগার, ক্লিনিক এবং মর্গসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সুবিধা। তুরস্কের আর্থিক সহায়তায় নির্মিত এই মসজিদটি পশ্চিম আফ্রিকার সর্ববৃহৎ মসজিদ হিসেবে পরিচিত। দীর্ঘ আট বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হিসেবে, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই ঘানার প্রেসিডেন্ট নানা আকুফো-আদ্দোর করকমলে এই মহান মসজিদটি উদ্বোধিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নাইজারের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ বাজুম, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মহামাদু ইসুফো এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। ঘানার জাতীয় মসজিদ কমপ্লেক্সটি পশ্চিম আফ্রিকার মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য একটি দীর্ঘদিনের স্বপ্নের বাস্তবায়ন। মসজিদের স্থাপত্যশৈলী তুরস্কের বিখ্যাত সুলতান আহমেদ মসজিদের অনুপ্রেরণায় নির্মিত। এটি ঐতিহাসিক 'উসমানীয় পুনরুদ্ধার শৈলীর একটি উজ্জ্বল নিদর্শন, যার মধ্যে মাটি থেকে প্রায় ৬৫ মিটার উঁচু চারটি বিশাল মিনার রয়েছে। মসজিদের বাহ্যিক অংশ কারারা মার্বেল দিয়ে নির্মিত, যা এর স্থায়িত্ব ও সৌন্দর্যকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। অভ্যন্তরের নকশায় নীল রঙের ব্যবহার মসজিদের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যকে করেছে আরও মনোমুগ্ধকর। হাতে আঁকা কুরআনিক ক্যালিগ্রাফি, নকশাযুক্ত কাঁচের জানালা এবং মার্বেল মেহরাব এই স্থাপত্যকর্মের শৈল্পিক মানকে আরও উন্নত করেছে। মসজিদ কমপ্লেক্সটি প্রায় বিয়াল্লিশ একর এলাকাজুড়ে বিস্তৃত এবং এতে একাধিক সুবিধা রয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছাত্রাবাস এবং অতিথিদের জন্য বাসস্থান। মসজিদের কেন্দ্রীয় গম্বুজের চারপাশে ক্যাসকেড ও মেহরাবে স্ট্যালাক্টাইট কুলুঙ্গি রয়েছে, যা এর স্থাপত্য শৈলীকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। ঘানার ইতিহাসে ইসলামের আগমন ঘটেছে প্রায় পাঁচ শতক আগে, যখন মুসলিম বণিকরা পশ্চিম আফ্রিকায় প্রবেশ করে। ইসলামের সঙ্গে সঙ্গে তারা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এনেছিল, যা ঘানার মুসলিম সমাজে গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে। মসজিদ নির্মাণ প্রকল্পটি এই ঐতিহ্যের আধুনিক প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা মুসলিম সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিচয়ের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। প্রায় পাঁচ হাজার মুসল্লি একসাথে সালাত আদায় করার সুযোগ করে দেওয়ায় এটি আফ্রিকার বৃহত্তম মসজিদের মর্যাদা পেয়েছে। বিশ্বের নানা প্রান্তে তুরস্কের ধর্ম বিভাগ, ওয়াকফ বিভাগ এবং দানবীরদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়েছে। তাদের মধ্যে ঘানার জাতীয় মসজিদ একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপনা। মসজিদটি আফ্রিকায় ধর্মীয় ঐক্য ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির এক অসাধারণ প্রতীক হয়ে উঠেছে। আশা করা যাচ্ছে, ভবিষ্যতে ঘানা জাতীয় মসজিদ ঘানার মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে এবং তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে থাকবে। ❑

* *শিক্ষার্থী, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।*

বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ড

(বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিচালিত)

ইবতেদায়ী ৫ম ও মুতাওয়াসসিতা ৩য় (অষ্টম) শ্রেণীর

বৃত্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ড-এর** অধীনে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ ও শিক্ষার্থীদেরকে আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, গত ০১ জুন ২০২৪ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পরীক্ষা বাস্তবায়ন কমিটির সভায় ২০২৪ইং শিক্ষাবর্ষে ইবতেদায়ী ৫ম ও মুতাওয়াসসিতা ৩য় (অষ্টম) শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উল্লেখিত ইবতেদায়ী ৫ম শ্রেণীর জন্য মেধা তালিকায় ৫০ (পঞ্চাশ) জন ও জেলাভিত্তিক ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) জন এবং মুতাওয়াসসিতা ৩য় (অষ্টম) শ্রেণীর জন্য মেধা তালিকায় ৩০ (ত্রিশ) জন ও জেলাভিত্তিক ১২০ (একশত বিশ) জনকে দুই ধাপে প্রায় ১৫,০০,০০০/- (পনেরো লক্ষ) টাকা বৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে।

বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ড-এর অধীনে কুল্লিয়া, সানাবিয়া, মুতাওয়াসসিতা ও হিফযুল কুরআন বিভাগের ২০২৪ইং শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষা পূর্ব নির্ধারিত সময়েই অনুষ্ঠিত হবে। তবে, ইবতেদায়ী ৫ম শ্রেণী এবং মুতাওয়াসসিতা ৩য় (অষ্টম) শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা আগামী ৮ ও ৯ জানুয়ারী ২০২৫ইং তারিখে বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত কেন্দ্রগুলোতে অনুষ্ঠিত হবে ইনশা আল্লাহ।

অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষার মানবন্টন নিম্নরূপ: ইবতেদায়ী ৫ম শ্রেণী-

১. হিফযুল কুরআন ও তাজভীদ, ২. সরফ (মীযান ও মুনশাইব), ৩. আল উলূম আশ শারঈয়্যাহ ও ৪. দুরূসুল লুগাহ আল আরাবিয়্যাহ (২য় খণ্ড) (৪টি বিষয়), প্রতি বিষয়ে ২৫ নম্বর মোট ১০০ নম্বর।

৫. বাংলা, ৬. ইংরেজী ও ৭. গণিত যথাক্রমে ৩০+৩০+৪০= ১০০ নম্বর।

মোট ২টি পরীক্ষা ১০০×২=২০০ নম্বর।

মুতাওয়াসসিতা ৩য় (অষ্টম) শ্রেণী-

১. হিফযুল কুরআন ও অনুবাদ, ২. আল হাদীস (বুলুগুল মারাম), ৩. উসূলুল হাদীস (আতইয়াবুল মিনাহ) ৪. আকীদাহ (কিতাবুত তাওহীদ) ৫. ফিকহ (আল ফিকহুল মুয়াসসার), ৬. নাহু (শারহু মিআতি আমেল), ৭. সরফ (শাযাল আরফ ফী ফান্নিস সারফ), ৮. আরবী সাহিত্য, ৯. ইতিহাস (আহলে হাদীস পরিচিতি), ১০. বাংলা, ১১.ইংরেজী ও ১২. গণিত। প্রতি পরীক্ষায় ৪টি বিষয়, প্রতি বিষয়ে ২৫ নম্বর, মোট ৩টি পরীক্ষা- ১০০×৩= ৩০০ নম্বর।

অতএব, **বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ড-এর** অধীনে অনুষ্ঠিতব্য বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রতিষ্ঠানকে বোর্ডে'র সাথে অধিভূক্ত করত: শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিশেষ আহ্বান জানানো হচ্ছে।

বি. দ্র. পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য রেজিস্ট্রেশন ও ফরম ফিলাপের নির্ধারিত তারিখ যথাসময়ে ঘোষণা করা হবে। তবে, প্রতিষ্ঠানের অধিভুক্তি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সংযুক্তি: ১. ইবতেদায়ী ৫ম শ্রেণী ও মুতাওয়াসসিতা ৩য় (অষ্টম) শ্রেণীর বিস্তারিত সিলেবাস।

২. ইবতেদায়ী ৫ম শ্রেণী ও মুতাওয়াসসিতা ৩য় (অষ্টম) শ্রেণীর বিস্তারিত মানবন্টন।

এছাড়াও আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য বোর্ড অফিস, ওয়েবসাইট, অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ ও মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করুন।

১. www.talimiboard.org

২. **Facebook:** www.facebook.com/bahtb.dhaka

৩. মোবাইল নম্বর: +৮৮০ ১৯৩৩৩৫৫৯০৯, +৮৮০ ২২-২৩৩৪৫৩৯৯

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ'র আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, সালাত টাইম ও ইসলামিক ফাইন্ডার-এর সময় সমন্বয়ে ২০২৪ ইং অনুযায়ী দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি (সেপ্টেম্বর-২০২৪)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	'ঈশা
০১	০৪ : ২৪	০৫ : ৪০	১১ : ৫৯	০৩ : ২৬	০৬ : ১৬	০৭ : ৩৩
০২	০৪ : ২৪	০৫ : ৪০	১১ : ৫৮	০৩ : ২৬	০৬ : ১৫	০৭ : ৩২
০৩	০৪ : ২৫	০৫ : ৪০	১১ : ৫৮	০৩ : ২৬	০৬ : ১৪	০৭ : ৩১
০৪	০৪ : ২৫	০৫ : ৪১	১১ : ৫৮	০৩ : ২৫	০৬ : ১৩	০৭ : ৩০
০৫	০৪ : ২৬	০৫ : ৪১	১১ : ৫৭	০৩ : ২৫	০৬ : ১২	০৭ : ২৯
০৬	০৪ : ২৬	০৫ : ৪১	১১ : ৫৭	০৩ : ২৫	০৬ : ১১	০৭ : ২৮
০৭	০৪ : ২৭	০৫ : ৪২	১১ : ৫৭	০৩ : ২৪	০৬ : ১০	০৭ : ২৭
০৮	০৪ : ২৭	০৫ : ৪২	১১ : ৫৬	০৩ : ২৪	০৬ : ০৯	০৭ : ২৬
০৯	০৪ : ২৮	০৫ : ৪২	১১ : ৫৬	০৩ : ২৩	০৬ : ০৮	০৭ : ২৫
১০	০৪ : ২৮	০৫ : ৪৩	১১ : ৫৬	০৩ : ২৩	০৬ : ০৭	০৭ : ২৩
১১	০৪ : ২৮	০৫ : ৪৩	১১ : ৫৫	০৩ : ২৩	০৬ : ০৬	০৭ : ২২
১২	০৪ : ২৯	০৫ : ৪৩	১১ : ৫৫	০৩ : ২২	০৬ : ০৫	০৭ : ২১
১৩	০৪ : ২৯	০৫ : ৪৪	১১ : ৫৫	০৩ : ২২	০৬ : ০৪	০৭ : ২০
১৪	০৪ : ৩০	০৫ : ৪৪	১১ : ৫৪	০৩ : ২১	০৬ : ০৩	০৭ : ১৯
১৫	০৪ : ৩০	০৫ : ৪৪	১১ : ৫৪	০৩ : ২১	০৬ : ০২	০৭ : ১৮
১৬	০৪ : ৩০	০৫ : ৪৫	১১ : ৫৪	০৩ : ২০	০৬ : ০১	০৭ : ১৭
১৭	০৪ : ৩১	০৫ : ৪৫	১১ : ৫৩	০৩ : ২০	০৬ : ০০	০৭ : ১৬
১৮	০৪ : ৩১	০৫ : ৪৫	১১ : ৫৩	০৩ : ১৯	০৫ : ৫৯	০৭ : ১৫
১৯	০৪ : ৩২	০৫ : ৪৬	১১ : ৫২	০৩ : ১৯	০৫ : ৫৮	০৭ : ১৩
২০	০৪ : ৩২	০৫ : ৪৬	১১ : ৫২	০৩ : ১৮	০৫ : ৫৭	০৭ : ১২
২১	০৪ : ৩২	০৫ : ৪৬	১১ : ৫২	০৩ : ১৮	০৫ : ৫৬	০৭ : ১১
২২	০৪ : ৩৩	০৫ : ৪৭	১১ : ৫১	০৩ : ১৭	০৫ : ৫৫	০৭ : ১০
২৩	০৪ : ৩৩	০৫ : ৪৭	১১ : ৫১	০৩ : ১৭	০৫ : ৫৪	০৭ : ০৯
২৪	০৪ : ৩৩	০৫ : ৪৭	১১ : ৫১	০৩ : ১৬	০৫ : ৫৩	০৭ : ০৮
২৫	০৪ : ৩৪	০৫ : ৪৮	১১ : ৫০	০৩ : ১৬	০৫ : ৫২	০৭ : ০৭
২৬	০৪ : ৩৪	০৫ : ৪৮	১১ : ৫০	০৩ : ১৫	০৫ : ৫১	০৭ : ০৬
২৭	০৪ : ৩৫	০৫ : ৪৮	১১ : ৫০	০৩ : ১৪	০৫ : ৫০	০৭ : ০৫
২৮	০৪ : ৩৫	০৫ : ৪৯	১১ : ৪৯	০৩ : ১৪	০৫ : ৪৯	০৭ : ০৪
২৯	০৪ : ৩৫	০৫ : ৪৯	১১ : ৪৯	০৩ : ১৩	০৫ : ৪৮	০৭ : ০৩
৩০	০৪ : ৩৬	০৫ : ৪৯	১১ : ৪৯	০৩ : ১৩	০৫ : ৪৭	০৭ : ০২

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

MEMBER
ATAB
MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ৭০ নয়াপল্টন (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০, ফোন: ৯৩৩৪২৮০, ৯৩৩৩৫৮৬, মোবা: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫
চাঁপাই নবাবগঞ্জ অফিস: বড় ইন্দারা মোড়, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ■ PRICE Tk. 25.00

الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتقنية ببنغلاديش

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ

IIUSTB

ভর্তি চলছে

সরকার এবং ইউজিসি অনুমোদিত

অনার্স প্রোগ্রাম

মেধাবৃত্তির সুবিধা

- B.A in Al Quran and Islamic Studies
- B.Sc in Computer Science & Engineering
- B.Sc in Electrical & Electronic Engineering
- Bachelor of Business Administration

মাস্টার্স প্রোগ্রাম

- M.A in Al Quran and Islamic Studies
- Master of Business Administration

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব ৯ একর জমির উপর স্থায়ী গ্রীন ক্যাম্পাস
- উচ্চতর গবেষণা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমন্ডলী
- ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব
- আধুনিক মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস
- 'সাইলেন্ট স্টাডি' এবং 'গ্রুপ স্টাডি' সুবিধাসহ বিশাল লাইব্রেরী
- ২৪x৭ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা প্রহরী
- শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে ইনটেনসিভ কেয়ার এবং কাউন্সেলিং
- ২৪x৭ বিদ্যুৎ (নিজস্ব ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর)

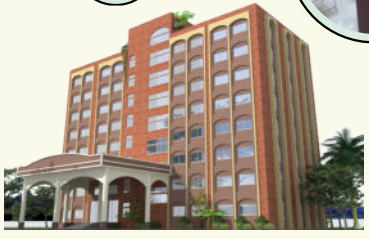

নিজস্ব খেলার মাঠ

01329-728375-78 www.iiustb.ac.bd info@iiustb.ac.bd

স্থায়ী ক্যাম্পাস : বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯। (বাইপাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে আধা কি.মি. উত্তরে, ঢাকা-ইপিজেড সংলগ্ন)

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত